HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – ব্রিটিশ-ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ ও ভারত বিভাগ

টপিক – ০১ বাংলাদেশের অতীত পরিচয়

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: বাংলাদেশের অতীত পরিচয়
টপিক ০২: ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগমন
টপিক ০৩: পলাশীর যুদ্ধঃ বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব প্রতিষ্ঠা
টপিক ০৪: ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা
টপিক ০৫: ১৮৬১ সালের ভারতীয় পরিষদ আইন
টপিক ০৬: ভারতীয় কাউন্সিল বা পরিষদ আইন, ১৮৯২
টপিক ০৭: ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা
টপিক ০৮: বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৫
টপিক ০৯: বঙ্গভঙ্গের মূল্যায়ন/বঙ্গভঙ্গের ফলাফল
টপিক ১০: স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৩-১৯০৮)
টপিক ১১: বঙ্গভঙ্গ রদ

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ১২: ১৯০৬ সালে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠা এবং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

টপিক ১৩: ভারতীয় কাউন্সিল আইন, ১৯০৯ বা মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন

টপিক ১৪: ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন বা মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন

টপিক ১৫: দ্বৈতশাসন

টপিক ১৬: খিলাফত আন্দোলন

টপিক ১৭: অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-১৯২২)

টপিক ১৮: সাইমন কমিশন

টপিক ১৯: নেহরু রিপোর্ট, ১৯২৮

টপিক ২০: গোলটেবিল বৈঠক, ১৯৩০-১৯৩২

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ২১: ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন
টপিক ২২: ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের গভর্নর জেনারেল
টপিক ২৩: ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন
টপিক ২৪: ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন
টপিক ২৫: হক মন্ত্রিসভা (১৯৩৭-১৯৪১)
টপিক ২৬: জিন্নাহর 'দ্বিজাতি তত্ত্ব'
টপিক ২৭: লাহোর প্রস্তাব, ১৯৪০
টপিক ২৮: মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা, ১৯৪৬
টপিক ২৯: ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন
টপিক ৩০: বাংলায় মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা (সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা)
টপিক ৩১: ১৯৪৬-৪৭ সালে 'স্বাধীন সার্বভৌম অখণ্ড বাংলার' পরিকল্পনা, তাৎপর্য ও পরিণতি

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ৩২: ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন

টপিক ৩৩: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

টপিক ৩৪: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: বাংলাদেশের অতীত পরিচয়

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বাংলাদেশের অতীত পরিচয়

বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশের ইতিহাস বৈচিত্র্যময়। এ ইতিহাস অন্যায়, শোষণ, বঞ্চনা ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাস। এ ইতিহাস বাঙালির হাসি-কান্না ও দুঃখ-বেদনার ইতিহাস। বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতার পূজারী। স্বাধীনতার জন্য তাদেরকে দিতে হয়েছে অনেক রক্ত; সহ্য করতে হয়েছে জুলুম ও নির্যাতন।

প্রাচীন যুগে 'বাংলা' নামে কোনো অখণ্ড রাষ্ট্র বা জনপদ ছিল না। প্রাচীন বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে তখন রাঢ়, গৌড়, বরেন্দ্র, লক্ষণাবতী, পুণ্ড্রবর্ধন, বঙ্গ, সমতট, হরিকেল প্রভৃতি বিভিন্ন নামের জনপদ বা রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। এর মধ্যে 'বঙ্গ' একটি অতি প্রাচীন জনপদ।

পণ্ডিত ও গবেষকদের মতে, 'বঙ্গ' থেকে 'বাংলা' নামের উৎপত্তি হয়েছে। সম্রাট আকবরের নবরত্ন সভার অমূল্য রত্ন ও প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল ফজলের মতে, বাংলার প্রাচীন নাম ছিল 'বঙ্গ'। প্রাচীনকালে নদীমাতৃক বঙ্গদেশের রাজারা দশ গজ উঁচু ও চওড়া প্রকাণ্ড 'আল' বা বাঁধ তৈরি করতেন। 'বঙ্গ' শব্দের সাথে এই 'আল' শব্দ যুক্ত হয়ে এদেশের নাম হয়েছে 'বাঙ্গালা' এবং এ জাতির নাম হয়েছে 'বাঙ্গাল'।

বাংলাদেশের অতীত পরিচয়

১২০৩ সালে দিল্লির সুলতান কুতুব উদ্দিন আইবেকের একজন ক্ষুদ্র জায়গীরদার ও সেনানায়ক ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি এক অতর্কিত আক্রমণে সেন বংশের রাজা লক্ষ্মণসেনকে পরাজিত করে রাজধানী নদীয়া দখল করেন। এরপর ধীরে ধীরে বাংলাদেশ দিল্লির সুলতানদের অধীনে একটি 'সুবা' বা প্রদেশে পরিণত হয়। তবে পরবর্তীতে দিল্লির সুলতানদের অযোগ্যতা এবং দিল্লি সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খলতার সুযোগে ১৩৩৮-৪০ সালে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ্ সোনারগাঁয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁর শাসনামলে ১৩৪৫-৪৬ সালে বিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা বাংলাদেশে এসেছিলেন। ইবনে বতুতার মতে, সে সময়ে এদেশে সাত টাকায় ৮০ মণ চাল এবং সাড়ে তিন টাকায় ১৪ সের ঘি পাওয়া যেত। এ সময়ে বাংলাদেশে দ্রব্যসামগ্রীর প্রাচুর্যের ফলে জনজীবনে আর্থিক সচ্ছলতা এবং সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। হযরত শাহজালাল (রহ.) এ সময়েই সিলেটে ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

বাংলাদেশের অতীত পরিচয়

১৩৫২ সালে লক্ষণাবতী এবং পাণ্ডুয়ার স্বাধীন শাসক শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্ সোনারগাঁ এবং পরে সমগ্র বাংলাদেশ দখল করে 'শাহ্-ই-বাঙ্গালা' উপাধি ধারণ করেন। ইলিয়াস শাহী বংশ ১৪৮৭ সাল পর্যন্ত স্বাধীনভাবে বাংলাদেশ শাসন করেছিল। এ বংশের শাসনামলে বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এ সময়ে বাংলা ভাষার উন্নতি সাধিত হয়। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্ (১৪৯৩-১৫১৯) 'হোসেন শাহী' বংশের এবং বাংলার মুসলিম শাসকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন। এ সময়ে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি আরো বিকশিত ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। ১৫৭৬ সালের ১২ জুলাই রাজমহলের যুদ্ধে দিল্লির পরাক্রমশালী মুঘল সম্রাট আকবরের নিকট বাংলাদেশের স্বাধীন কররানী আফগান বংশীয় সুলতান দাউদ খান কররানী পরাজিত হন। এর ফলে বাংলাদেশ ধীরে ধীরে প্রত্যক্ষ মুঘল শাসনাধীনে চলে যায়। তবে বাংলার বড় বড় জমিদাররা মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন যুদ্ধ করেছেন এবং নিজেদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এসব জমিদার 'বার ভূঁইয়া' নামে পরিচিত। বার ভূঁইয়ারা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন মুঘল সুবেদার ইসলাম খানের শাসনামলে (১৬০৮-১৬১৩ খ্রি.)। তিনি বার ভূঁইয়াদেরকে দমন করার উদ্দেশ্যে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে ১৬০৮ সালে বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের নামে ঢাকার নামকরণ করা হয় 'জাহাঙ্গীরনগর'।

বাংলাদেশের অতীত পরিচয়

মুর্শিদ কুলী খান (প্রকৃত নাম মুহাম্মদ হাদী করতলব খান) ১৭০০ সালে বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত হন। তিনি ১৭০২ সালে ঢাকা থেকে মকসুদাবাদে তাঁর বাসস্থান ও দেওয়ানি কার্যালয় স্থানান্তর করেন। মকসুদাবাদের পরবর্তীতে নামকরণ করা হয় মুর্শিদ কুলী খানের নামানুসারে 'মুর্শিদাবাদ'। তিনি পরবর্তীতে ১৭১৭ সালে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হলে মুর্শিদাবাদ বাংলার রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। ধীরে ধীরে তিনি এবং তাঁর বংশধরগণ স্বাধীন শাসক বা নবাবের মতোই বাংলাদেশ শাসন করতে থাকেন। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার তথা নবাব আলীবর্দী খানের মৃত্যুর পর বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার তথা নবাব হন সিরাজউদ্দৌলা। মুর্শিদ কুলী খান থেকে সিরাজউদ্দৌলা পর্যন্ত সকলেই মুঘল সম্রাটের অধীন বাংলার সুবাদার হলেও মূলত তাঁরা ছিলেন অনেকটা স্বাধীন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – ব্রিটিশ-ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ ও ভারত বিভাগ

টপিক – ০২ ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগমন

টপিক ০২: ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগমন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগমন

প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য ইংরেজগণ ১৬০০ সালে ২১৮ জন সদস্য নিয়ে লন্ডনে 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' নামে একটি বণিক সংঘ গঠন করে। উক্ত সালের ৩১ ডিসেম্বর এ বণিক সংঘ "দি গভর্নর এন্ড কোম্পানি অব মার্চেন্টস অব লন্ডন ট্রেডিং ইন টু দি ইস্ট ইন্ডিয়া" নামে রানি এলিজাবেথের নিকট থেকে সনদ লাভ করে। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬১৩ সালে এক ফরমানের মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে সুরাটে বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের অনুমতি প্রদান করেন। বাংলার সুবেদার শাহজাদা সুজা ইংরেজ চিকিৎসক জিব্রাইল ব্রাউটনের চিকিৎসায় সন্তুষ্ট হয়ে মাত্র তিন হাজার টাকা করের বিনিময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার প্রদান করেন। ১৬৯০ সালে সম্পাদিত একটি সন্ধি চুক্তি মোতাবেক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সমগ্র ভারতবর্ষে বার্ষিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার ফিরে পায়। এ সন্ধির ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জব চার্নকের নেতৃত্বে ১৬৯০ সালের ২৪ আগস্ট সুতানটিতে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। বাংলার সুবেদার শাহজাদা আযিমুদ্দিনের শাসনকালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬৯৬-৯৮ সালে সুতানটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর-এ তিনটি গ্রামের জমিদারি সনদ লাভ করে।

ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগমন

জব চার্নকের প্রচেষ্টায় এখানে কলিকাতা বন্দর ও শহরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় এবং অতি দ্রুত তা সমৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়। ১৬৯৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলিকাতায় 'ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ' স্থাপন করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চিকিৎসক সার্জেন্ট উইলিয়াম হ্যামিল্টন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত দিল্লির সম্রাট ফররুখ শিয়রকে সুস্থ করে তুললে ১৭১৭ সালে সম্রাট এক ফরমান জারি করে সমগ্র ভারতবর্ষে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করাসহ অনেক সুযোগ-সুবিধা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে প্রদান করেন। চতুর ইংরেজরা এ ফরমানবলে প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করে কলিকাতায় দুর্ভেদ্য দুর্গ তৈরি করেন এবং বাংলার শাসকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেন। নবাব আলীবর্দী খানের শাসনামলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কয়েকবার অবাধ্যতা প্রকাশ করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – ব্রিটিশ-ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ ও ভারত বিভাগ

টপিক – ০৩ পলাশীর যুদ্ধঃ বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব প্রতিষ্ঠা

টপিক ০৩: পলাশীর যুদ্ধঃ বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব প্রতিষ্ঠা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ গ ঘ

পলাশীর যুদ্ধঃ বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব প্রতিষ্ঠা

নবাব আলীবর্দী খানের মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা ১৭৫৬ সালের ১০ এপ্রিল বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাবি মসনদে আরোহণ করেন। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকরা সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসন আরোহণ উপলক্ষে উপহার-উপঢৌকন প্রদানসহ তাঁকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেও ইংরেজরা তা করেনি। এছাড়াও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কৃষ্ণবল্লভসহ নবাবের অবাধ্য কর্মচারীদেরকে আশ্রয় প্রদান করে নবাবের সাথে প্রত্যক্ষ বিরোধিতা শুরু করেন। এসব অন্যায় কাজ বন্ধ করার জন্য নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর ড্রেককে নির্দেশ প্রদান করলে তিনি তা উপেক্ষা করেন। এ সময় ইংরেজরা নবাবের আদেশ অমান্য করে কলিকাতায় দুর্গ নির্মাণ করতে শুরু করে। অবাধ্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে নবাব ১৭৫৬ সালের ৪ জুন কাশিমবাজার কুঠি অধিকার করেন এবং কলিকাতা অভিমুখে অগ্রসর হন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর ড্রেক তাঁর পরিষদের সদস্য ও অন্যান্য ইংরেজদেরকে নিয়ে জাহাজে আশ্রয় গ্রহণ করেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা বীরদর্পে ১৭৫৬ সালের ২০ জুন কলিকাতা দখল করেন। নবাব তাঁর অন্যতম সেনাধ্যক্ষ মানিকচাঁদের উপর কলিকাতার শাসনভার অর্পণ করে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর শুরু হয় নবাবের বিরুদ্ধে তাঁর অমাত্যবর্গের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র।

পলাশীর যুদ্ধঃ বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব প্রতিষ্ঠা

উমিচাঁদের উদ্যোগে মীরজাফর আলী খান, রাজা রায়দুর্লভ, রাজা রাজবল্লভ, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এজেন্ট ওয়াটসন প্রমুখ জগৎশেঠের বাসভবনে এক গোপন বৈঠকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সহযোগিতায় নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার এবং মীরজাফরকে নবাবি মসনদে বসানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নবাব সিরাজউদ্দৌলা এ গোপন ষড়যন্ত্র ও চুক্তির কথা জানতে পেরে মীরজাফর আলী খানকে প্রধান সেনাপতি ও বশীর পদ হতে অপসারিত করে আবদুল হাদী খানকে সে পদে নিয়োগ করেন। বিচক্ষণ, নবাবভক্ত ও দেশপ্রেমিক সভাসদ ও সেনানায়কদের নিষেধ সত্ত্বেও জগৎশেঠ প্রমুখের পরামর্শে এবং মীরজাফর আলী খান কর্তৃক পবিত্র কুরআন শরীফ স্পর্শ করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে নবাব পুনরায় মীরজাফর আলী খানকে প্রধান সেনাধ্যক্ষ ও বশী পদে নিয়োগ করেন।

পলাশীর যুদ্ধঃ বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব প্রতিষ্ঠা

রবার্ট ক্লাইভ তার সেনাবাহিনীসহ মুর্শিদাবাদ আক্রমণে অগ্রসর হলে বিশ্বাসঘাতক সেনাধ্যক্ষ মীরজাফরের গোপন আদেশের ফলে হুগলি ও কাটোয়ার ফৌজদাররা বাধা প্রদান করেনি। নবাব সিরাজউদ্দৌলা ক্লাইভকে বাধাদানের উদ্দেশ্যে পলাশীর প্রান্তরে উপস্থিত হন। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধ শুরু হলে মোহনলাল, মীরমদন ও সিনফ্রের আক্রমণে ক্লাইভের সৈন্যরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। এ সময় ইংরেজ সেনাদের নিক্ষিপ্ত গুলিতে মীরমদন নিহত হলে শোকাতুর নবাবকে সান্ত্বনা দেওয়ার ছল করে মীরজাফর সেদিনের মতো নবাবকে যুদ্ধ স্থগিত রাখার পরামর্শ প্রদান করেন। মোহনলাল ও সিনফ্রে নবাবকে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার পরামর্শ প্রদান করেন। কেননা ক্লাইভের সৈন্যগণ তখন পশ্চাৎপদ হয়ে আম্রকুঞ্জের আড়ালে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের অনুরোধ সত্ত্বেও নবাব সিরাজউদ্দৌলা মীরজাফরের পরামর্শ অনুযায়ী সেদিনের মতো যুদ্ধ বন্ধ করার আদেশ প্রদান করেন। বিজয়ের মুখে যুদ্ধ বন্ধ করার এ আদেশ নবাব সৈন্যদেরকে নিরুৎসাহিত করে তোলে। ধূর্ত রবার্ট ক্লাইভ এ সুযোগে এবং বিশ্বাসঘাতক সেনাধ্যক্ষ মীরজাফরের ইঙ্গিতে নবাবের বাহিনীকে আক্রমণ করে বসেন। এর ফলে মীরজাফরের আদেশে নবাবের সেনাবাহিনী ক্লাইভের বাহিনীকে বাধা না দিয়ে নিষ্ক্রিয় থাকে। সেনাধ্যক্ষ মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় পলাশীর প্রান্তরে অনেকটা বিনাযুদ্ধে রবার্ট ক্লাইভ জয়লাভ করেন।

পলাশীর যুদ্ধঃ বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব প্রতিষ্ঠা

পরাজিত নবাব সিরাজউদ্দৌলা সৈন্য সংগ্রহের আশায় পাটনার উদ্দেশ্যে রাজমহলের পথে যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে মীরজাফরের জামাতা মীর কাশিম কর্তৃক নবাব ধৃত হন। ধৃত নবাবকে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসা হয়। মীরজাফরের দুশ্চরিত্র পুত্র মীরনের আদেশে প্রচুর বখশিস পাবার লোভে মোহাম্মদী বেগ (নবাব আলীবর্দী খাঁ ও নবাব সিরাজউদ্দৌলার আশ্রয় ও দয়ায় মোহাম্মদী বেগ নবাব প্রাসাদেই মানুষ হয়েছিলেন এবং সেখানেই থাকতেন) ১৭৫৭ সালের ২৯ জুন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যার পর বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর আলী খান সেদিনই বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হন। পলাশীর যুদ্ধের পর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৫৭ সাল থেকে ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত 'নবাব' নামধারী মীরজাফরের বংশধর কয়েকজন সাক্ষীগোপাল শাসককে সম্মুখে রেখে প্রকৃত শাসন চালাতে থাকে। ইংরেজরাই পর্দার অন্তরালে হয়ে পড়েন নবাব-নির্মাতা বা প্রকৃত নবাব।

পলাশীর যুদ্ধঃ বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব প্রতিষ্ঠা

বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কারস্বরূপ ইংরেজদের সহযোগিতায় মীরজাফর নবাব হয়ে ইংরেজদের সাথে পূর্বের গোপন চুক্তি মোতাবেক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে চব্বিশ পরগণার জমিদারি প্রদান করেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নবনিযুক্ত গভর্নর ভেন্সিটার্ট গায়ের জোরে মীরজাফরকে সরিয়ে মীর কাশিমকে নবাবের সিংহাসনে বসান। নতুন নবাব গোপন চুক্তির শর্তানুযায়ী ইংরেজদের বকেয়া পাওনা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন এবং ১৭৬০ সালে মেদিনীপুর, বর্ধমান ও চট্টগ্রাম-এ জেলা তিনটির জমিদারিও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে ছেড়ে দেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই মীর কাশিমের সাথে ইংরেজদের বিরোধিতা এমনকি ১৭৬৩ সালে যুদ্ধও শুরু হয়। ১৭৬৪ সালের ২২ অক্টোবর মীর কাশিম, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের মিলিত সেনাবাহিনী বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনীর নিকট পরাজয় বরণ করে। এ যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই ইংরেজরা মীরজাফরকে দ্বিতীয়বার বাংলার নবাব বলে ঘোষণা করে। ১৭৬৫ সালে মীরজাফরের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র নজমুদ্দৌলা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে অপমানকর সন্ধি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে বাংলার নবাব হন। ১৭৬৫ সালের ২০ ফেব্রুয়ারির এ অপমানজনক সন্ধির শর্তানুযায়ী বাংলার পূর্ণ শাসন ক্ষমতা নবাবের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে 'নায়েবে নাজিম' নামক একজন মন্ত্রীর হাতে অর্পণ করা হয়। 'নায়েবে নাজিম' ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক মনোনীত হতেন।

পলাশীর যুদ্ধঃ বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব প্রতিষ্ঠা

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৬৫ সালে বছরে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা দেওয়ার বিনিময়ে মুঘল সম্রাটের নিকট থেকে এক ফরমানবলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা অর্থাৎ 'দেওয়ানি সনদ' লাভ করেন। এভাবেই ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বিজয় অর্জন ও ১৭৬৫ সালে রাজস্ব আদায়ের আইনসঙ্গত অধিকার বা দেওয়ানি লাভ করে। কূটবুদ্ধি ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্লাইভ বাংলার তথা ভারতের মাটিতে ব্রিটিশ শাসনের ভিতকে মজবুত করতে সমর্থ হন। তারই উদ্যোগ, চাতুর্য ও কূটবুদ্ধিতে 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির' মতো একটি বিদেশি বেনিয়া কোম্পানি অতি দ্রুত এদেশের শাসকশ্রেণিতে পরিণত হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – ব্রিটিশ-ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ ও ভারত বিভাগ

টপিক – ০৪ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে বাংলার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা

টপিক ০৪: ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে বাংলার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে বাংলার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে বাংলা তথা ভারতের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ছিল নিম্নরূপ :

অর্থনৈতিক অবস্থা : ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শোষণ, নির্যাতন, কুশাসন, লুণ্ঠন প্রভৃতির ফলে ভারতবর্ষের সাধারণ জনগণের অর্থনৈতিক জীবন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনামলে 'একসালা' ও 'পাঁচসালা' বন্দোবস্তের ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেনিয়া রাজস্ব আদায়কারী ঠিকাদারদের অত্যাচারে বাংলার জনগণের আর্থিক মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে। লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনামলে ১৭৯৩ সালে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' ঘোষিত হলে জমির উপর মালিকানা এমনকি হস্তান্তর, পত্তন ও ইজারা দেওয়ার ক্ষমতাও জমিদাররা লাভ করেন। এর ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেনিয়া ও দালালি করে যারা নগদ অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন তারাই জমিদারি ক্রয় করে নতুন জমিদার হন। এসব নব্য জমিদারদের সময় ভূমি রাজস্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। পূর্বের অধিকাংশ মুসলমান জমিদার তাদের জমিদারি হারান। মুসলমানরা লাখেরাজ ও ওয়াকফ সম্পত্তি ভোগের অধিকার থেকেও বঞ্চিত হন।

এর ফলে বাংলার কৃষক সমাজ বিশেষ করে মুসলমান কৃষক সমাজ সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। শিল্প বিপ্লবের পর ব্রিটেনে বড় বড় শিল্প-কলকারখানা গড়ে ওঠে। এসব শিল্প-কলকারখানার কাঁচামাল যেত ভারতবর্ষ থেকে। বিনিময়ে ব্রিটেনে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী ভারতে আসতো। এর ফলে ভারতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্প ধ্বংস হয়ে যায়। এসব কুটির শিল্প ও হস্তশিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট তন্তুবায় ও কারিগরগোষ্ঠী ধ্বংস হয়ে যায়। এভাবেই ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতবর্ষের বিশেষ করে বাংলার কৃষক সমাজ অর্থনৈতিক দিক থেকে পঙ্গু, রিক্ত ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে বাংলার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা

সামাজিক অবস্থা : ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দু জনগণের মধ্যে ধীরে ধীরে একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটলেও মুসলমান জনগণ দীর্ঘদিন এক্ষেত্রে ছিল পিছিয়ে। মুসলমান জনগণ ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষালাভ থেকে বিরত থাকায় সামাজিক দিক থেকেও পিছিয়ে পড়ে। এজন্য ব্রিটিশ শাসননীতি যেমন দায়ী ছিল, তেমনি একশ্রেণির গোঁড়া মুসলমানের প্রচার-প্ররোচনাও দায়ী ছিল। 'লাখেরাজ সম্পত্তি' এবং ১৭৯৮ সালে 'পল্লি পুলিশ ব্যবস্থা' বিলুপ্ত করার ফলে এবং সবশেষে ১৮৩৭ সালে ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজিকে অফিস-আদালতের ভাষারূপে প্রচলনের ঘোষণা প্রদানের ফলে এদেশের মুসলমান জনগণ চাকরি ও অন্যান্য সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি হারান।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে বাংলার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা

হিন্দু-মুসলমানের অসম বিকাশ: চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যে নতুন জমিদার শ্রেণির সৃষ্টি হয় তারা প্রায় সকলেই ছিলেন হিন্দু। ধীরে ধীরে হিন্দু সম্প্রদায় ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষালাভ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। রাজা রামমোহন রায়ের প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ এবং রাধাকান্ত দেবের শিক্ষা অনুরাগ একটি শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণি সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। বাংলায় নবজাগরণের সৃষ্টি হয়। শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণি পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ ও উদারনৈতিক চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসেন। পরবর্তীতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখের চেষ্টায় বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত জনগণ শিক্ষা-দীক্ষায় আরো অগ্রসর হন। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু জনগণ ১৮৪৩ সালে Bengal British India Society গঠন করেন। এ সমিতির উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে সংগঠিত করা এবং ভারতীয়দের ন্যায্য অধিকার সম্পর্কে ব্রিটিশ শাসকদের মনোযোগ আকর্ষণ করা। ১৮৫১ সালে British India Association, ১৮৭৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এবং আনন্দমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় Indian Association এবং ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই শহরে "সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের" জন্ম হয়। কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতীয় জনগণ বিশেষ করে শিক্ষিত হিন্দু জনগণ নিজেদেরকে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করার প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে বাংলার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা

অপরদিকে, ১৭৫৭ সালের পর থেকে মুসলমান জনগণের চিন্তা-চেতনা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে থাকে। হিন্দু জনগণ যেভাবে ব্রিটিশ শাসনকে মেনে নিতে পেরেছিল মুসলমানরা তা পারেনি। মুসলমানরা দীর্ঘদিন সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে হারানো স্বাধীনতা ফিরে পাবার স্বপ্নে বিভোর ছিল। ফলে ব্রিটিশ সরকারও তাদেরকে সুনজরে দেখেনি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমান জমিদারদের প্রায় সকলেই তাদের জমিদারি হারান। একশ্রেণির মুসলমানের প্রচার-প্ররোচনার ফলে মুসলমান জনগণ ইংরেজি ভাষা শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ ও জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা থেকে বিরত থাকে।

হিন্দু সমাজে যেমন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো মুক্তবুদ্ধির অধিকারী সমাজ সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটেছিল মুসলমান সমাজে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকে সেরূপ মনীষীর আগমন ঘটেনি। ফলে মুসলমান সমাজ রক্ষণশীলতা ও ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হতে পারেনি। বরং সৈয়দ আহমেদ ব্রেলভী, তিতুমীরের মতো মুসলমান নেতাগণ সশস্ত্র বিপ্লব ঘটিয়ে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের বিপ্লব ব্যর্থ হয় এবং ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের প্রতি আরো বৈরী আচরণ শুরু করে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে বাংলার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা

'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতি (Divide and Rule Policy): ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর থেকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য প্রথম থেকেই 'ভাগ কর ও শাসন কর নীতি' কার্যকরী করার চেষ্টা চালায়। মুসলমান জনগণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে তাদের নবাবি ও শাসন ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। সুচতুর ইংরেজ শাসকগণ এ সময় হিন্দু জনগণকে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত করে তুলতে থাকেন। ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি, নতুন নতুন জমিদারি হিন্দুদের করায়ত্ত হতে থাকে। হিন্দু জনগণ ব্রিটিশদের অনুগত থেকে নিজেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়াতে সক্ষম হন। সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী, হাজী শরীয়তউল্লাহ, তিতুমীর প্রমুখের আন্দোলনের ফলে মুসলমান জনগণের প্রতি ব্রিটিশ শাসকগণ আরো সন্দিহান হয়ে পড়েন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে বাংলার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা

১৮৯২ সাল থেকে শুরু হয় হিন্দু পুনর্জাগরণমূলক আন্দোলন। এ সময় থেকে কংগ্রেসের হিন্দু জাতীয়তাবাদী চরমপন্থি নেতাদের কার্যকলাপে ব্রিটিশ সরকার সন্দিহান হয়ে পড়ে। সুচতুর ও সাবধানী ব্রিটিশ শাসকগণ এরপর মুসলমান জনগণকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের কৌশল বা নীতি গ্রহণ করে। হিন্দু পুনর্জাগরণ ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল কলিকাতাকে দুর্বল করার জন্যই ব্রিটিশ শাসকগণ বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অপরদিকে ১৮৫৮ সালের পর থেকে স্যার সৈয়দ আহমদ খান, নবাব আব্দুল লতিফ প্রমুখের প্রচেষ্টায় মুসলমান জনগণ ইংরেজি ভাষা, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষালাভে সচেষ্ট হয় এবং ধীরে ধীরে তাদের উপর থেকে ব্রিটিশ বিদ্বেষ হ্রাস পেতে থাকে। তারপর যতবারই হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল, ততবারই ব্রিটিশ সরকার 'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতি বা কৌশল (Divide and Rule Policy) প্রয়োগ করে হিন্দু-মুসলিম অনৈক্য ও সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দিয়ে এবং তাকে জীবিত রেখেই প্রায় দু'শ বছর ভারতবর্ষে তাদের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ চালাতে সক্ষম হয়েছিল।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – ব্রিটিশ-ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ ও ভারত বিভাগ

টপিক – ০৫ ১৮৬১ সালের ভারতীয় পরিষদ আইন

টপিক ০৫: ১৮৬১ সালের ভারতীয় পরিষদ আইন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

১৮৬১ সালের ভারতীয় পরিষদ আইন

পটভূমি: ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ব্রিটিশ ভারতে যুগান্তকারী প্রভাব ফেলে। এর ফলে ১৮৫৮ সালে 'মহারাণির রাজকীয় ঘোষণা' এবং ১৮৫৮ সালের 'ভারত শাসন আইন' দ্বারা ভারতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটানো হয়। ভারতবর্ষের যাবতীয় বিষয়ে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উপর অর্পিত হয়। এ সময় ভারতীয় জনগণের সহযোগিতা লাভ, আইন পরিষদের ক্ষমতা নির্ধারণ, ত্রুটিপূর্ণ আইনগুলোর সংশোধন ও পরিমার্জন করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে ব্রিটিশ সরকার নতুন করে একটি আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং-এর সুপারিশের ভিত্তিতে ভারতসচিব স্যার চার্লস উড ব্রিটিশ কমন্সসভায় একটি বিল পেশ করেন। এ বিলটি ১৮৬১ সালের ১ আগস্ট রানির সম্মতি লাভ করে এবং আইনে (Act) পরিণত হয়। এ আইন '১৮৬১ সালের ভারতীয় পরিষদ আইন' (Indian Council Act, 1861) নামে খ্যাত।

১৮৬১ সালের ভারতীয় পরিষদ আইন

প্রধান প্রধান ধারা বা বৈশিষ্ট্য (Main Features): ১৮৬১ সালের ভারতীয় পরিষদ আইনের প্রধান প্রধান ধারা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

১। আইনসভা গঠন: এ আইনে ভারতে সর্বপ্রথম একটি আইনসভা গঠনের বিধান এবং এতে ভারতীয় সদস্য মনোনয়ন দানের ব্যবস্থা করা হয়। ব্যবস্থাপক পরিষদের (Legislative Council) সদস্য সংখ্যা ১২ জন করা হয়। এর ফলে আইনসভা অর্থাৎ ব্যবস্থাপক পরিষদের আয়তন বৃদ্ধি পায়। এ আইনে বলা হয় যে, ভারতীয় সদস্যগণ গভর্নর জেনারেল কর্তৃক ভারতীয়দের মধ্য থেকে মনোনীত হবেন এবং তাঁরা 'বেসরকারি সদস্য' (non-official) বলে অভিহিত হবেন।

২। গভর্নর জেনারেলের নির্বাহী পরিষদ: গভর্নর জেনারেলের নির্বাহী পরিষদকে (Executive Council) ৫ সদস্যবিশিষ্ট করা হয়। এর মধ্যে ৩ জনকে অন্তত ১০ বছর ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে।

৩। নির্বাহী পরিষদ সদস্যদের নিয়োগ ব্যবস্থা: নির্বাহী পরিষদের ৩ জন সদস্যকে ভারত সচিব নিয়োগ দান করবেন। নির্বাহী পরিষদের অপর ২ জন সদস্য ব্রিটিশরাজ কর্তৃক নিয়োজিত হবেন। এ দু'জন সদস্যের একজন হবেন আইন বিষয়ক সদস্য এবং অপরজন হবেন অর্থবিষয়ক সদস্য।

১৮৬১ সালের ভারতীয় পরিষদ আইন

৪। পোর্টফোলিও পদ্ধতি : এ আইনে শাসন কাজের সুবিধার জন্য 'পোর্টফোলিও পদ্ধতি' প্রবর্তন করা হয়। এর ফলে শাসন বা নির্বাহী পরিষদের সদস্যগণের কেউ শাসন, কেউ অর্থ, কেউ আইন বা কেউ সামরিক দপ্তরের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। এর ফলে ভবিষ্যতে ক্যাবিনেট ব্যবস্থা উদ্ভবের পথ প্রশস্ত হয়।

৫। গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা: (ক) প্রয়োজনবোধে যেকোনো প্রদেশের সীমানা পরিবর্তনের ক্ষমতা গভর্নর জেনারেলকে প্রদান করা হয়।

(খ) জরুরি অবস্থাকালীন সময়ে ৬ মাস মেয়াদের জন্য 'অধ্যাদেশ' (Ordinance) জারি করার ক্ষমতা গভর্নর জেনারেল বা ভাইসরয়ের হাতে অর্পণ করা হয়।

(গ) গভর্নর জেনারেল ব্যবস্থাপক পরিষদের যেকোনো বিল বা আইন ভেটো প্রয়োগ করে নাকচ করে দিতে পারতেন।

৬। সেনাবাহিনী প্রধান: ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান (Commander-in-Chief) নির্বাহী পরিষদের অতিরিক্ত সদস্যপদ লাভ করবেন।

৭। নির্বাহী পরিষদের বৈঠক পরিচালনা: গভর্নর জেনারেলের হাতে নির্বাহী পরিষদের বৈঠক পরিচালনার ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়।

১৮৬১ সালের ভারতীয় পরিষদ আইন

৯। প্রাদেশিক সরকারগুলোর ক্ষমতা: এ আইন দ্বারা বোম্বাই ও মাদ্রাজের প্রাদেশিক সরকার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা লাভ করে এবং পাঞ্জাব ও বাংলা প্রদেশে 'প্রাদেশিক আইন পরিষদ' (Provincial Legislative Council) গঠিত হয়।

১০। বাংলার গভর্নর নির্বাহী পরিষদের বৈঠক যখন কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে তখন বাংলার গভর্নর অতিরিক্ত সদস্য হিসেবে বৈঠকে যোগ দিতে পারবেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – ব্রিটিশ-ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ ও ভারত বিভাগ

টপিক – ০৬ ভারতীয় কাউন্সিল বা পরিষদ আইন, ১৮৯২

টপিক ০৬: ভারতীয় কাউন্সিল বা পরিষদ আইন, ১৮৯২

This Topic is important for

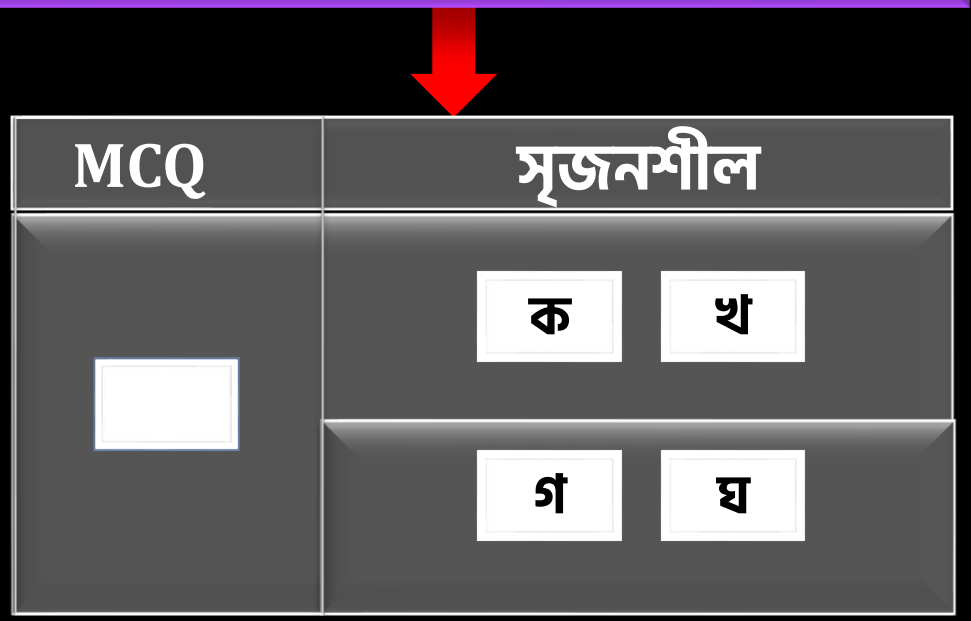

ভারতীয় কাউন্সিল বা পরিষদ আইন, ১৮৯২

পটভূমি: ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে জনগণের মনে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ তীব্র হয়। সরকারের উচ্চ পদগুলো ইংরেজ সিভিলিয়ানদের জন্য সংরক্ষণ করার দরুন সমালোচনা আরম্ভ হয়। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলোও জনমতকে জাগিয়ে তোলে এবং সরকারের সমালোচনা দ্বারা রাজনৈতিক চেতনার প্রসার ঘটায়। লর্ড লিটনের প্রতিক্রিয়াশীল শাসননীতি ভারতীয় শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। লর্ড লিটনের সংবাদপত্র দমন আইন এবং অস্ত্র আইন-এর বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী তীব্র আন্দোলন শুরু করেন। লর্ড রিপনের আমলে 'ইলবার্ট বিল' সম্পর্কে বিতর্ক আরম্ভ হলে ব্রিটিশ শাসকদের জাতি-বৈষম্যনীতির উগ্রতা ধরা পড়ে। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর হতে ভারতীয়দের দাবিগুলো আরও তীব্র হয়ে উঠতে থাকে। এ প্রেক্ষাপটে ভারতের তৎকালীন ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল লর্ড ডাফরিন আইন পরিষদগুলোর সংস্কারের উদ্দেশ্যে স্যার জেমস্ চেসনি, স্যার চার্লস এচিশন এবং জেমস্ ওয়েস্টল্যান্ডকে নিয়ে একটি কমিটি নিয়োগ করেন। উক্ত কমিটি ১৮৮৮ সালের ১০ অক্টোবর তাঁদের রিপোর্ট পেশ করে। কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ভারত সচিব লর্ড ক্রস (Lord Cross)-এর চেষ্টায় ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি বিল উপস্থাপন করা হয়। ১৮৯২ সালে সংশোধিত আকারে বিলটি আইনে রূপান্তরিত হয়। এ আইনটিই '১৮৯২ সালের ভারতীয় পরিষদ আইন' (The Indian Councils Act of 1892) নামে পরিচিত।

ভারতীয় কাউন্সিল বা পরিষদ আইন, ১৮৯২

প্রধান ধারা বা বৈশিষ্ট্যসমূহ (Main Features) : ১৮৯২ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইনের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হলো:

(ক) কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের গঠন: ১৮৯২ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইনে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের গঠন সম্পর্কে বলা হয় যে:

১। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলোর সদস্য সংখ্যা বর্ধিত করা হবে।

২। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে সর্বনিম্ন ১০ জন সদস্য এবং সর্বোচ্চ ১৬ জন অতিরিক্ত সদস্য নিয়োগ করা হবে।

৩। অতিরিক্ত সদস্যদের মধ্যে ৬ জনের বেশি সরকারি (Official) সদস্য হতে পারবেন না।

৪। অতিরিক্ত সদস্যরা ভারত সচিবের সম্মতিক্রমে গভর্নর জেনারেল কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।

৫। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের মোট সদস্যদের ভাগ বেসরকারি সদস্য হবেন। অর্থাৎ ১৬ জন অতিরিক্ত সদস্যের মধ্যে ১০ জন হবেন বেসরকারি সদস্য।

৬। বেসরকারি সদস্যদের কয়েকজন হবেন নির্বাচিত সদস্য এবং বাকি সকলে হবেন গভর্নর জেনারেলের মনোনীত সদস্য।

ভারতীয় কাউন্সিল বা পরিষদ আইন, ১৮৯২

৭। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্যগণ সরকারের বার্ষিক অর্থনৈতিক রিপোর্ট আলোচনার সুযোগ পাবেন এবং ইচ্ছা করলে এর সমালোচনা করতে পারবেন। কিন্তু এ রিপোর্টের কোনো সংশোধন তাঁরা করতে পারবেন না।

৮। আইন পরিষদের সদস্যগণ ৬ দিনের নোটিসের ভিত্তিতে জনস্বার্থ বিষয়ে সরকারের কাছে প্রশ্ন রাখতে পারবেন। কিন্তু তাঁরা সম্পূরক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারবেন না।

৯। আইন পরিষদের সভাপতি কোনো কারণ না দেখিয়েই যেকোনো প্রশ্ন নাকচ করতে পারবেন।

১০। আইন পরিষদের কার্যনির্বাহ করার জন্য গভর্নর জেনারেল যে বিধি রচনা করবেন, সদস্যরা সে বিধি মেনে নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবেন।

ভারতীয় কাউন্সিল বা পরিষদ আইন, ১৮৯২

(খ) প্রাদেশিক আইন পরিষদের গঠন: প্রাদেশিক আইন পরিষদের গঠন সম্পর্কে বলা হয় যে :

১। কেন্দ্রের মতো প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলোর সদস্যসংখ্যাও বৃদ্ধি করা হবে।

২। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যসংখ্যা ২০ জনের বেশি হবে না।

৩। বোম্বাই ও মাদ্রাজের আইন পরিষদগুলোর সদস্যসংখ্যা নিম্নতম ৮ এবং ঊর্ধ্বতন ২০ জনের বেশি হবে না।

৪। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও অযোধ্যা আইন পরিষদের সদস্যসংখ্যা হবে ১৫ জন।

৫। প্রাদেশিক আইন পরিষদ সদস্যগণ জনস্বার্থ বিষয়ক প্রশ্ন সরকারকে করতে পারবেন।

৬। প্রাদেশিক আইন পরিষদ সদস্যগণ সরকারের বিভিন্ন নীতির উপর বিতর্ক করতে পারবেন।

৭। প্রাদেশিক আইন পরিষদের সভাপতি হিসেবে গভর্নর জেনারেল সদস্যদের কোনো কোনো প্রশ্ন ইচ্ছা করলে অগ্রাহ্য করতে পারবেন।

৮। গভর্নর জেনারেলের পূর্ব অনুমতি সাপেক্ষে প্রাদেশিক আইন পরিষদ নতুন আইন তৈরি বা পুরনো আইন বাতিল করতে পারবেন।

৯। আইন ও বিধি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে 'সপরিষদ গভর্নর জেনারেল' (Governor General-in-Council)-এর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কোনো প্রভাব বিস্তার করবে না।

ভারতীয় কাউন্সিল বা পরিষদ আইন, ১৮৯২

(গ) নির্বাচন বিধি: এ আইনে গভর্নর জেনারেলকে সদস্য মনোনয়ন সম্পর্কে নিয়ম-বিধি রচনার ক্ষমতা দেয়া হয়। তবে ভারত সচিব (Secretary of State for India)-এর অনুমোদন সাপেক্ষে গভর্নর জেনারেলকে এ ক্ষমতা প্রয়োগের কথা উল্লেখ করা হয়। নিচে কেন্দ্র ও প্রদেশের নির্বাচন বিধি উল্লেখ করা হলো:

১। কেন্দ্রে নির্বাচন বিধি: এ আইনে বলা হয় যে:

(ক) কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে ৫ জন নির্বাচিত সদস্য থাকবেন।

(খ) এ ৫ জন সদস্য পৌরসভা, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও অন্যান্য বাণিজ্যিক সংস্থার সুপারিশের ভিত্তিতে মনোনীত হবেন।

(গ) এদের মধ্যে ৪ জন সদস্য বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও উত্তর প্রদেশের প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য দ্বারা মনোনীত হবেন।

(ঘ) অবশিষ্ট ১ জন সদস্য কলিকাতা বণিকসভা বা চেম্বারস্ অব কমার্স-এর সুপারিশের ভিত্তিতে মনোনীত হবেন।

(ঙ) কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের বেসরকারি সদস্যগণ গভর্নর জেনারেল কর্তৃক মনোনীত হবেন।

ভারতীয় কাউন্সিল বা পরিষদ আইন, ১৮৯২

২। প্রদেশে নির্বাচন বিধি: এ আইনে প্রদেশে নির্বাচন বিধি সম্পর্কে বলা হয় যে:

(ক) প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যগণ জেলা বোর্ড, পৌরসভা বা মিউনিসিপ্যালিটি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, বণিক ও শিল্পপতিদের সভার সুপারিশের ভিত্তিতে মনোনীত হবেন।

(খ) মাদ্রাজ আইন পরিষদের ২০ জন অতিরিক্ত সদস্যদের মধ্যে ৯ জন সরকারি, ৪ জন মনোনীত বেসরকারি এবং বাকিরা নির্বাচিত হবেন।

(গ) নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ৪ জন পৌরসভা ও জেলা বোর্ড হতে এবং অপর ৩ জন মাদ্রাজ কর্পোরেশন, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং চেম্বারস্ অব কমার্স হতে নির্বাচিত হবেন।

ভারতীয় কাউন্সিল বা পরিষদ আইন, ১৮৯২

সাংবিধানিক গুরুত্ব : ১৮৯২ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইনের সাংবিধানিক গুরুত্ব ছিল নিম্নরূপ :

১। প্রতিনিধিত্বশীল শাসনের ভিত্তি স্থাপন: ১৮৯২ সালের পরিষদ আইনকে ভারতে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা গঠনের প্রাথমিক ধাপ বলা যায়। এ আইনের বলে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, আশুতোষ মুখার্জী, রাসবিহারী ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী প্রমুখ প্রতিভাবান ভারতীয় রাজনীতিক ভাইসরয়ের আইন পরিষদে যোগ দেয়ার সুযোগ পান। তাঁরা আইন পরিষদে তাঁদের যোগ্যতা প্রদর্শন করে ভারতবাসী যে স্বায়ত্তশাসন লাভের উপযুক্ত তা প্রমাণ করেন।

২। নির্বাচন নীতির স্বীকৃতি: এ আইনের মাধ্যমেই ভারতের সাংবিধানিক ইতিহাসে 'নির্বাচনের নীতি' প্রথম বারের মতো স্বীকৃতি লাভ করে। ফলে ভারতীয় আইন পরিষদগুলোর কাজ এখন থেকে কেবলমাত্র আইন প্রণয়ন ও উপদেশমূলক কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইলো না। পরিষদগুলো নির্বাচনমূলক কাজও করতে শুরু করে।

৩। আইনসভার আর্থিক ক্ষমতা: ১৮৯২ সালের আইনে আইন পরিষদের সদস্যদের সরকারের অর্থনৈতিক রিপোর্ট আলোচনা এবং সমালোচনা করার সুযোগ দেয়া হয়। ফলে সরকার তাদের ভুলভ্রান্তি দূর করার ব্যাপারে যত্নবান হন।

ভারতীয় কাউন্সিল বা পরিষদ আইন, ১৮৯২

৪। সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি : ১৮৯২ সালের আইনে ১৮৬১ সালের আইনের তুলনায় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলোর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়।

৫। প্রশ্ন জিজ্ঞাসার অধিকার: এ আইনে পরিষদের সদস্যগণ নির্বাহী বিভাগকে প্রশাসনিক বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার এবং এভাবে তথ্য লাভ করার অধিকার লাভ করেন।কীতে কাশমোঃ ক্যাখ্যান তীনুর মুলারহাদের কথা ি

৬। সংসদীয় পদ্ধতির সূচনা: ব্রিটিশ ভারতে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ আইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – ব্রিটিশ-ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ ও ভারত বিভাগ

টপিক – ০৭ ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

টপিক ০৭: ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

পটভূমি: ১৮৭৮ সালে লর্ড লিটনের শাসনামলে দেশীয় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার উদ্দেশ্যে 'ভার্নাক্যুলার প্রেস এ্যাক্ট', 'লাইসেন্স এ্যাক্ট' প্রভৃতি কালা-কানুন পাস হয়। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে ভারতীয় জনগণ এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ১৮৮৩ সালে 'ইলবার্ট বিল' পাস হলে ব্রিটিশ শাসকদের প্রতি ভারতীয় জনগণের অসন্তোষ ও ঘৃণা আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। দমননীতি প্রয়োগের পাশাপাশি ভারতীয় জনগণের এ গণবিক্ষোভকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে পরিচালনা ও দমনের জন্য সুচতুর ব্রিটিশ সরকার ভিন্নপথ অবলম্বন করে। এ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম নামক একজন প্রাক্তন আমলা বড়লাট লর্ড ডাফরিনকে ভারতীয় জনগণের আসন্ন গণবিদ্রোহ থেকে বাঁচার জন্য একটি ব্রিটিশ অনুগত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের পরামর্শ প্রদান করেন। ৪ এ সময় ভারতীয় শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণিও একটি রাজনৈতিক সংগঠন সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছিল। এভাবে হিউমের উদ্যোগে এবং লর্ড ডাফরিনের সমর্থনে ১৮৮৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর বোম্বাই শহরে 'সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' (All India National Congress) নামক একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দাদাভাই নওরোজী, স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের চেষ্টায় ব্রিটিশ সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে ভারতীয় উঠতি ধনিক শ্রেণি এবং ব্রিটিশ অনুগত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্ররূপে কংগ্রেস বিকশিত হতে থাকে।

১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকালীন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠালগ্নে বলা হয়েছিল যে, "ইংরেজ শাসনের প্রতি অবিচল আনুগত্যই হবে এই প্রতিষ্ঠানের মূলভিত্তি।" ফিরোজ শাহ্ মেহতা, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, রাসবিহারী বসু প্রমুখ মধ্যপন্থি কংগ্রেস নেতাগণের উদ্দেশ্য ছিল ভারতে সকল জাতির সমন্বয়ে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অভাব-অভিযোগ দূর করার উদ্দেশ্যে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে দেশের জনমত সংগঠিত করা এবং দেশের শাসন ব্যবস্থায় জনগণের জন্য কিছু অংশীদারিত্ব অর্জনই ছিল এর লক্ষ্য। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে প্রায় সকল নেতারই বক্তব্য ছিল নবগঠিত সংগঠনটির লক্ষ্য হবে ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা। এর পাশাপাশি নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে কংগ্রেস তাদের দাবি-দাওয়া ব্রিটিশরাজকে এবং ভারতীয় শাসকগণকে অবহিত করবে।

১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

বাঙালি ব্যারিস্টার উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জি কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে এর সভাপতি ব্যারিস্টার উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হবে:

১। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমস্ত এলাকার লোকদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন।

২। পারস্পরিক সৌহার্দের মাধ্যমে সমস্ত বর্ণবৈষম্য দূরীকরণ এবং বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ়করণ।

৩। দৈনন্দিন জাতীয় প্রশ্নে ভারতের বিশিষ্ট জ্ঞানী, গুণী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত যাচাই করা। ভারতবর্ষের জনগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে তা সমাধানের প্রচেষ্টা চালানো।

৪। পরবর্তী এক বছরে জনস্বার্থে রাজনীতিবিদগণ কী করবেন সেজন্য নীতি নির্ধারণ ও রাজনৈতিক অগ্রগতির জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা।

১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

কংগ্রেসের বিকাশধারা ও কার্যক্রম

১৮৮৫ সালে যাঁরা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁরা ছিলেন উদারনৈতিক মনোভাবাপন্ন এবং ব্রিটিশরাজ তথা ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুগত (Loyal)। কংগ্রেসের এসব উদারনৈতিক নেতা শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক উপায়ে ব্রিটিশ সরকারের নিকট দাবি-দাওয়া উত্থাপন করতে সচেষ্ট হন। ১৮৮৫-১৮৯২ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের মূল নেতা ছিলেন এ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম। তিনি কংগ্রেসের দাবি-দাওয়া ভারতে এবং বিলাতে প্রচারের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। ১৮৯২ সালে হিউম ভারত ছেড়ে চলে গেলে রানাডে, ফিরোজশাহ্ মেহতা, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি প্রমুখ নেতা মূলত আবেদন-নিবেদনের মধ্যেই কংগ্রেসের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখেন।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হলে বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। কংগ্রেস নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলার সর্বত্র বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলন অতি দ্রুত ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়। শুরু হয় ইংরেজদের বিরুদ্ধে বয়কট আন্দোলন যা 'স্বদেশি আন্দোলনে' পরিণত হয়। ১৯০৫ সালে বারানসীতে কংগ্রেসের অধিবেশনে চরমপন্থিদের মতাদর্শেরই বিজয় ঘটে এবং স্বদেশি আন্দোলনের সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

১৯০৬ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচন নিয়ে নরমপন্থি ও চরমপন্থিদের মধ্যকার বিরোধ তুঙ্গে উঠে। নরমপন্থি নেতা ফিরোজ শাহ্ মেহতা কৌশলে প্রবীণ নেতা দাদাভাই নৌরোজীর নাম সভাপতি হিসেবে প্রস্তাব করলে অধিকাংশ সদস্য তা সমর্থন করেন এবং কংগ্রেসের বিরোধ আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা প্রশমিত হয়। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এবং আপসের ভিত্তিতে বয়কট, স্বদেশি, জাতীয় শিক্ষা ও স্বরাজ আন্দোলনের সপক্ষে এ অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯০৭সালের সুরাট অধিবেশনেও কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন নিয়ে বিরোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নরমপন্থি নেতাগণ রাসবিহারী ঘোষকে কংগ্রেসের সভাপতি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অপরদিকে, চরমপন্থিরা বালগঙ্গাধর তিলককে সভাপতি করার সংকল্প করেন। নরমপন্থি নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে রাসবিহারী ঘোষের নাম প্রস্তাব করলে অধিবেশনস্থলে প্রথমে হাতাহাতি এবং পরে তা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। মডারেট নেতারা ছিলেন ইংল্যান্ডে শিক্ষিত। ইংরেজি ভাষা, সাহিত্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং ব্রিটিশ সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি এ সকল নেতার ছিল প্রচণ্ড মোহ।

১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

তাঁদের সকলের ছিল আর্থিক প্রাচুর্য ও আড়ম্বর। গণআন্দোলনকে এসব মডারেট কংগ্রেস নেতাগণ সযত্নে এড়িয়ে চলার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। মোটকথা বিনীত ভাষায় প্রস্তাব গ্রহণ, আইনসভার সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির দাবি জ্ঞাপন, আইনসভায় নির্বাচিত সদস্য নিয়োগ, আই.সি.এস. পরীক্ষায় বেশি ভারতীয় গ্রহণ প্রভৃতি দাবি-দাওয়া সরকারের নিকট পেশ করার মধ্যেই তাঁরা সন্তুষ্ট ছিলেন। ইংরেজরা ভারত ছেড়ে চলে যাক বা ভারতবাসী স্বাধীনতা লাভ করুক-এ রকম চিন্তা তাঁদের কল্পনার অতীত ছিল। ৮ আদি কংগ্রেস নেতাদের এ আন্দোলন ও সংগ্রামবিমুখিতা এবং আবেদন-নিবেদন নীতি গ্রহণের জন্য তাঁদেরকে নরমপন্থি বা মডারেট (moderate) বলে অভিহিত করা হয়।

১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

১৯০৮ সালে এলাহাবাদ অধিবেশনে কংগ্রেসের ভাঙন আরো স্থায়ীরূপ লাভ করে। এ সময় ব্রিটিশ সরকার সুযোগ বুঝে মডারেট নেতাদের যেমন কাছে টেনে নেন, তেমনি চরমপন্থি নেতাদের উপর দমননীতি চাপিয়ে দেন।১০ ব্রিটিশ সরকার চরমপন্থি নেতা বালগঙ্গাধর তিলককে ৬ বছরের জেল দিয়ে মান্দালয়ে পাঠান। অরবিন্দ ঘোষ মুরারিপুকুর বোমা মামলায় অভিযুক্ত হবার পর অব্যাহতি পেয়ে পণ্ডিচেরীতে যোগ সাধনায় রত হন। বিপিনচন্দ্র পাল নির্যাতন সইতে না পেরে সক্রিয় রাজনীতি আপাতত ছেড়ে দেন। লালা লাজপত রাই লন্ডনে পাড়ি জমান। এভাবেই চরমপন্থি আন্দোলনে ভাঁটা পড়ে। দীর্ঘকাল দক্ষিণ আফ্রিকায় আইন ব্যবসায় নিয়োজিত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ভারতে ফিরে এসে ১৯১৮ সাল থেকে কংগ্রেসের রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে গান্ধীজীর যোগদানের ফলে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। মূলত তাঁর নেতৃত্বেই কংগ্রেস ব্রিটিশ বিরোধী সর্বভারতীয় পর্যায়ে আন্দোলন শুরু করতে সমর্থ হয়। চরমপন্থি ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের বিফলতা ও মডারেটপন্থি আবেদন-নিবেদন নীতির ব্যর্থতা যখন কংগ্রেস নেতাদের হতাশার পাকে ডুবিয়েছিল তখন গান্ধীজী তাঁর অহিংস ও সত্যাগ্রহের নতুন নীতি দ্বারা কংগ্রেসে নবজীবন সঞ্চার করেন। রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে গান্ধীজী ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট হন। পাঞ্জাবের অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে সমগ্র ভারতবর্ষ গর্জে উঠে। গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে বেগবান করে তোলে।

১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

১৯২০ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে আইনসভা বর্জন ও বয়কট আন্দোলনের কৌশল নিয়ে গান্ধীজীর সাথে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, মতিলাল নেহেরু, জওহরলাল নেহেরু প্রমুখের মতবিরোধ ঘটে। ১৯২০ সালে নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশনে এ মতবিরোধ চরম আকার ধারণ করে। এ সময়ে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে এবং কৃষক-শ্রমিকরাও ব্যাপকহারে এসব আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে।

১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

১৯২২ সালে গয়ায় কংগ্রেসের অধিবেশনে আবারো দলীয় বিভেদ প্রকাশ্য হয়ে উঠে। গয়া কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস (C. R. Das) প্রস্তাব করেন যে, ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী আসন্ন নির্বাচনে যোগ দিয়ে আইনসভার সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়ে আইনসভার (কাউন্সিলে) ভেতরে সরকারকে সমালোচনা করে নাস্তানাবুদ করা হোক। মতিলাল নেহেরুসহ অনেকেই তাঁর মত সমর্থন করেন। কিন্তু রাজা গোপাল আচারী, কস্তুরী রঙ্গ আইয়ার, ডাঃ আনসারী প্রমুখ গান্ধীপন্থি নেতাগণ দেশবন্ধুর প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। ফলে কংগ্রেস মূলত দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। চিত্তরঞ্জন দাস ও মতিলাল নেহেরুর সমর্থক অংশটি অর্থাৎ যাঁরা কংগ্রেসের নীতি পরিবর্তন করে আইনসভার নির্বাচনে অংশ্রগ্রহণ করার পক্ষপাতী তাঁরা 'পরিবর্তনকামী' বা 'Pro-changer' বলে অভিহিত হন। অপরদিকে, যাঁরা আইনসভার নির্বাচনসহ সকল প্রকার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার কংগ্রেসের পূর্ব সিদ্ধান্তে অবিচল থাকার নীতিতে বিশ্বাসী, তাঁরা 'পরিবর্তনবিরোধী' বা 'No-Changer' বলে অভিহিত হতে থাকেন। পরে চিত্তরঞ্জন দাস ও মতিলাল নেহরু খিলাফতীদের সঙ্গে নিয়ে গঠন করেন "কংগ্রেস-খিলাফত স্বরাজ্য দল"। অবশ্য সাধারণ জনগণের নিকট তা 'স্বরাজ দল' নামে পরিচিত হয়ে উঠে। স্বরাজ দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে আশাতীত সফলতা অর্জন করে। কলকাতা কর্পোরেশনসহ বিভিন্ন নির্বাচনে স্বরাজ দল জয়যুক্ত হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের অসাম্প্রদায়িক কর্মসূচি মুসলমানদের মধ্যে আশার সঞ্চার করে।

১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

১৯২৮ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন বসলে সুভাষচন্দ্র বসু ও জওহরলাল নেহেরু পূর্ণ স্বরাজের দাবি উত্থাপন করেন। এজন্য তাঁরা কংগ্রেসের ভেতরেই "ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ" (Independence League) নামে একটি উপদল গঠন করেন। কলিকাতা অধিবেশনে গান্ধীজীর 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস' বনাম সুভাষচন্দ্র বসুর "পূর্ণ স্বরাজ" এর মধ্যে কোন্টি কংগ্রেসের নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হবে তা নিয়ে ভোটগ্রহণ করা হয়। আন্দোলনপন্থি এবং তরুণ ও যুবগোষ্ঠীর নিকট প্রিয় ও গ্রহণযোগ্য নেতা জওহরলাল নেহেরু গান্ধীজীর সমর্থনে ১৯২৯ সালে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন। জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে ১৯২৯ সালের ২৯ ডিসেম্বর লাহোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ঐতিহাসিক অধিবেশনে "পূর্ণ স্বরাজের" প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৩০ সালে লাহোর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে 'আইন অমান্য আন্দোলন' (১৯৩০-৩৪) শুরু করার নির্দেশ প্রদান করে। আইন অমান্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কংগ্রেস তার সংগঠনকে তৃণমূল পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়।

১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

১৯৩৭ সালে কংগ্রেস সভাপতি পদে নির্বাচনে সুভাষচন্দ্র বসু গান্ধীজীর নিজস্ব পছন্দের প্রার্থী সীতারামাইয়াকে পরাজিত করে কংগ্রেস সভাপতি হন। সুভাষচন্দ্রের বামপন্থি সম্পর্ক এবং চরমপন্থি মনোভাব গান্ধীজী ও কংগ্রেসের রক্ষণশীলদের অপছন্দনীয় ছিল। মহাত্মা গান্ধীর বিনা সম্মতিতে ব্রিটিশ সরকারকে চরমপত্র দেয়ার জন্য মহাত্মা গান্ধী ক্ষুব্ধ হন। তবে কংগ্রেসের বাম ও সমাজতন্ত্রী গোষ্ঠী, প্রজাতন্ত্রী গোষ্ঠী এবং কমিউনিস্টরা সুভাষচন্দ্র বসুকে সমর্থন জানান। ত্রিপুরী কংগ্রেসে গান্ধীজীর সাথে সুভাষচন্দ্র বসুর বিরোধ প্রকাশ্য রূপ লাভ করে। এরপর সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেন। কংগ্রেসের রক্ষণশীল নেতারা সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেন এবং দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অজুহাতে প্রথমে তাঁকে বাংলা কংগ্রেসের সভাপতির পদ হতে বহিষ্কার করেন এবং তিন বছরের জন্য কংগ্রেসের কোনো পদ গ্রহণের অনুপযুক্ত বলে ঘোষণা করেন। এরপর সুভাষচন্দ্র বসু “ফরোয়ার্ড ব্লক" নামে একটি নতুন দল গঠন করেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সিঙ্গাপুরে এসে বেতারে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের সংকল্প ঘোষণা করায় বিশেষ করে ১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর "আজাদ হিন্দ ফৌজ" গঠন করায় ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা দ্রুত পরিবর্তিত হয়।

১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

১৯৪২ সালের জুলাই মাসে ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির সভায় এবং বোম্বাইতে ১৯৪২ সালের ৮ আগস্ট কংগ্রেসের অধিবেশনে "ভারত ছাড়ো" বা "আগস্ট প্রস্তাব" গ্রহণ করা হয়। ৯ আগস্ট গান্ধীজী গ্রেপ্তার হন। পরবর্তী পর্যায়ে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল প্রমুখের সহযোগিতায় এবং জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস স্বাধীনতা আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। অবশেষে ভারত বিভক্ত হয় এবং ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট 'পাকিস্তান' ও 'ভারত' নামক দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – ব্রিটিশ-ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ ও ভারত বিভাগ

টপিক – ০৮ বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৫

টপিক ০৮: বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৫

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৫

ক. বঙ্গভঙ্গ : বঙ্গভঙ্গ অবিভক্ত বাংলায় তথা সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯০৫ সালের পূর্বে 'বাংলা প্রেসিডেন্সি' ছিল ভারতের সর্ববৃহৎ প্রদেশ। ১৯০৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা প্রদান করা হয় এবং ১৫ অক্টোবর থেকে তা কার্যকর হয়। ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগ এবং আসাম নিয়ে গঠিত হয় 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ'। ঢাকায় এ নতুন প্রদেশের রাজধানী স্থাপিত হয়। পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হয় 'পশ্চিমবঙ্গ' প্রদেশ। এর রাজধানী হয় কলিকাতা। অভিজ্ঞ প্রশাসক স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার ও এনড্র ফ্রেজার বঙ্গভঙ্গের জন্য ভারতের বড় লাট লর্ড কার্জনকে সর্বতোভাবে সাহায্য ও পরামর্শ প্রদান করেন। এজন্যই বঙ্গভঙ্গের পর নবগঠিত 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হন স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার এবং 'পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের' গভর্নর নিযুক্ত হন এনড্র ফ্রেজার। নবাব স্যার সলিমুল্লাহ্ বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে পূর্ববঙ্গের মুসলমান জনগণকে সংগঠিত করেন।

খ. বঙ্গভঙ্গের কারণ (Causes of Partition of Bengal): ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পেছনে প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ ছিল নিম্নরূপ :

বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৫

(১) প্রশাসনিক কারণ: ১৯০৫ সালের পূর্বে ব্রিটিশ ভারতে অবিভক্ত বঙ্গ প্রদেশই ছিল আয়তনে এবং জনসংখ্যায় সর্বাপেক্ষা বড় প্রদেশ। এর আয়তন ছিল প্রায় দুই লক্ষ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৭ কোটি ৮৫ লক্ষ। একজন গভর্নরের পক্ষে এতবড় প্রদেশ শাসন করা ছিল খুবই কষ্টকর। ১৯০২ সালের এপ্রিল মাসে এজন্যই লর্ড কার্জন ভারত সচিবকে লিখেছিলেন যে, "একটি মাত্র কেন্দ্র থেকে এত বড় ও বিশাল জনবহুল এলাকা শাসন করা সম্ভব নয়।" লর্ড কার্জনের এ লিখিত রিপোর্টের আলোকেই ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করে দুটি প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে, বঙ্গভঙ্গ করে দুটি প্রদেশ সৃষ্টি করা হলে সুষ্ঠু প্রশাসন গড়ে উঠবে এবং জনগণের দাবি ও সমস্যা মোকাবিলা করা সহজ হবে।

বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৫

(২) রাজনৈতিক কারণ: বঙ্গভঙ্গের পেছনে নিম্নলিখিত রাজনৈতিক কারণগুলো মুখ্য ছিল :

(ক) জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নস্যাৎ করা: ১৮৮৫ সালে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' নামক একটি রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়। কংগ্রেসের নেতৃত্বে সমগ্র ভারতে বিশেষ করে 'বাংলা প্রেসিডেন্সিতে' জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ছিল কলিকাতা শহর। সুচতুর ইংরেজ সরকার এ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে নস্যাৎ এবং আন্দোলনকারীদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার জন্য বঙ্গভঙ্গ করতে উদ্যোগী হন। ব্রিটিশ সরকার 'বিভেদ ও শাসন নীতি' (Divide and Rule Policy) অবলম্বন করে।

(খ) মুসলমানদের দাবি: স্যার সলিমুল্লাহ্ বঙ্গভঙ্গের পক্ষে আন্দোলন শুরু করেন। তিনি জনগণকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, নতুন প্রদেশ সৃষ্টি হলে পূর্ব-বাংলার মুসলমানরা নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের সুযোগ পাবে। হিন্দু সম্প্রদায় প্রভাবিত কলিকাতার উপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নির্ভরশীলতাও হ্রাস পাবে। মুসলমান জনগণ চাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি করতে পারবে।

বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৫

(৩) অর্থনৈতিক কারণ: (ক) ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পূর্বে শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত, কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি প্রায় সবকিছুই কলিকাতায় কেন্দ্রীভূত ছিল। ফলে পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা সর্বক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়েছিল। পূর্ববাংলার মুসলমান জনগণ হিন্দুদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। অধিকাংশ মুসলমান জনগণ এ সময়ে ভাবতে শুরু করে যে, বঙ্গভঙ্গ হলে তারা অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জনের সুযোগ পাবে।১৩ (খ) পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ জমিদারই ছিলেন হিন্দু। জমিদারগণ কলিকাতায় বাস করতেন। জনগণের সাথে তাঁদের কোনো যোগাযোগ ছিল না। জনগণের কল্যাণ ও সুখ-দুঃখের বিষয় নিয়ে তারা খুব বেশি চিন্তাও করতেন না। ফলে পূর্ববঙ্গের মুসলমান জনগণ বঙ্গভঙ্গের প্রতি সমর্থন জানায়।

(৪) সামাজিক কারণ: ব্রিটিশ শাসনামলে মুসলমান সম্প্রদায় নির্মমভাবে শোষিত বঞ্চিত হতে থাকে। ব্রিটিশ সরকার হিন্দুদের প্রতি উদার নীতি এবং মুসলমানদের প্রতি বৈরী নীতি অনুসরণ করতে থাকে। মুসলমানরা সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তিহীন একটি দরিদ্র, রিক্ত ও নিঃস্ব সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। সুতরাং লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গভঙ্গের চিন্তা-ভাবনা শুরু হলে পূর্ব-বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় স্বভাবতই এর প্রতি সমর্থন জানায়। বঙ্গ বিভাগের দ্বারা পূর্ব বঙ্গের মুসলমান জনগণ তাদের হারানো সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে থাকে।

বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৫

গ. হিন্দু ও মুসলমান জনগণের ওপর বঙ্গভঙ্গের প্রভাব (Impact of Partition of Bengal on Muslim and Hindu Community): ভারতীয় রাজনীতিতে বঙ্গভঙ্গের প্রভাব, প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। বঙ্গভঙ্গের ফলে অবিভক্ত বাংলার হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে দুই ধরনের বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায় :

(১) মুসলমানদের ওপর বঙ্গভঙ্গের প্রভাব (Impact of Partition of Bengal on Muslim Community) : ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সরকারি সিদ্ধান্ত মুসলমান জনগণের মধ্যে আনন্দ-উল্লাসের সৃষ্টি করে। 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামক নতুন প্রদেশকে পূর্ব বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় আশীর্বাদ বলে স্বাগত জানায়। কেননা, নতুন প্রদেশে তারাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। উৎফুল্ল মুসলমান জনগণ এই স্বপ্ন দেখতে লাগলেন যে, নতুন প্রদেশে তাঁরা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন এবং নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবে এবং চাকরি-বাকরি, শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য সবক্ষেত্রেই তাঁরা প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ব বাংলার মুসলমান জনগণ গর্ব ও মর্যাদাবোধ অনুভব করে। এর ফলে পূর্ব বাংলা তথা সমগ্র ভারতের মুসলমানদের মধ্যে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনার সৃষ্টি হয়। হিন্দুদের বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনকে মোকাবিলা করার জন্য মুসলমান বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতাগণ ১৯০৬ সালে 'মুসলিম লীগ' নামক একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। মুসলমানদের মধ্যে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটতে থাকে।

বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৫

(২) হিন্দুদের উপর বঙ্গভঙ্গের প্রভাব (Impact of Partition of Bengal on Hindu Community): বঙ্গভঙ্গ বাংলার হিন্দু জনগণ বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে ভীষণ ক্ষোভের সৃষ্টি করে। তাঁরা প্রচার করেন যে, বঙ্গভঙ্গ 'বঙ্গ মাতার অঙ্গচ্ছেদের সমতুল্য'। জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনায় বিকশিত হিন্দু জনসমাজ মনে করেন যে, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য বঙ্গভঙ্গ করা হয়েছে। হিন্দু লেখক-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতাগণ বঙ্গভঙ্গকে বাঙালি জাতির বিকাশমান ধারাকে নস্যাৎ করার গভীর ষড়যন্ত্র বলে প্রচার করেন। ব্রিটিশ সরকারের এ 'বিভেদ ও শাসন' নীতির বিরুদ্ধে তারা প্রচণ্ড গণআন্দোলন গড়ে তোলে। এর ফলে ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের জন্য 'স্বদেশি আন্দোলন' ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – ব্রিটিশ-ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ ও ভারত বিভাগ

টপিক – ০৯ বঙ্গভঙ্গের মূল্যায়ন/বঙ্গভঙ্গের ফলাফল

টপিক ০৯: বঙ্গভঙ্গের মূল্যায়ন/বঙ্গভঙ্গের ফলাফল

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বঙ্গভঙ্গের মূল্যায়ন/বঙ্গভঙ্গের ফলাফল

ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতির ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ একটি অনন্য সাধারণ ঘটনা। বঙ্গভঙ্গের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী।

১. ব্রিটিশদের 'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতির বিজয়: বঙ্গভঙ্গের ফলে ব্রিটিশ শাসকদের অনুসৃত 'ভাগ কর ও শাসন কর নীতি' (Divide & Rule Policy) জয়যুক্ত হয়। ব্রিটিশ শাসকগণ কৌশলে হিন্দু ও মুসলমান জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। ভারতের বৃহত্তম দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায় এর ফলে চিন্তা-চেতনার দিক থেকে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

২. ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নস্যাৎকরণ: বঙ্গভঙ্গের দ্বারা ব্রিটিশ শাসকগণ কৌশলে কলিকাতাকেন্দ্রিক সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নস্যাৎ করার সুযোগ লাভ করে। কেননা কলিকাতা শহরের লেখক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদগণ পূর্ববাংলার উপর নির্ভরশীল ছিল। বঙ্গভঙ্গের ফলে তারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৩. সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি: বঙ্গভঙ্গ হিন্দু-মুসলিম জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক চেতনার বিষবৃক্ষ রোপণ করে। এ সাম্প্রদায়িক চেতনাই পরবর্তীতে ভারত বিভাগকে অত্যাসন্ন করে তোলে।

বঙ্গভঙ্গের মূল্যায়ন/বঙ্গভঙ্গের ফলাফল

৪. মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রসার: বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলিম জাতীয়তাবাদের বীজ রোপিত হয়। মুসলমান জনগণ নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব ও স্বার্থ রক্ষার জন্য সংগঠিত হতে থাকে। তারা ১৯০৬ সালে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' নামক একটি পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে।

৫. মুসলিম লীগের জন্ম: নতুন প্রদেশের অস্তিত্ব রক্ষা এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে ১৯০৬ সালে ঢাকায় 'মুসলিম লীগ' নামক রাজনৈতিক সংগঠনের জন্ম হয়।

৬. হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতি: বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ খুশি হলেও হিন্দু সম্প্রদায় খুশি হয়নি। এজন্যই বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য হিন্দু জনগণ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ত সম্পর্কের সৃষ্টি হয়।

৭. স্বদেশি আন্দোলন: বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য হিন্দু জনগণ এবং কংগ্রেস স্বদেশি আন্দোলনের ডাক দেয়। আন্দোলনকারীরা বিলেতি দ্রব্য বর্জন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অফিস-আদালত বর্জনের ডাক দেয়। ফলে কলকারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

বঙ্গভঙ্গের মূল্যায়ন/বঙ্গভঙ্গের ফলাফল

৮. সন্ত্রাসবাদ ও উগ্র হিন্দুবাদীদের উত্থান: একদল উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসকদের এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য গোপন প্রচেষ্টা চালায়। এর ফলে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায় এবং রাজনীতিতে উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটে।

৯. পূর্ব বাংলার উন্নতি: বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ একে স্বাগত জানায়। পূর্ব বাংলার উন্নতি ও অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হয়। শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, যোগাযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

১০. ঢাকার উন্নয়ন ও মর্যাদা বৃদ্ধিকরণ : দীর্ঘদিন পর ঢাকা আবার রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। ঢাকার প্রাদেশিক

রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে এখানে হাইকোর্ট ভবন, সেক্রেটারিয়েট ভবন, আইনসভা ভবন নির্মাণ, পুরনো ভবন ও রাস্তাঘাট সংস্কার এবং নতুন নতুন প্রশাসনিক ভবন ও রাস্তাঘাট নির্মিত হতে থাকে। ফলে ঢাকার ক্ষমতা, মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।

বঙ্গভঙ্গের মূল্যায়ন/বঙ্গভঙ্গের ফলাফল

১১. আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি: ঢাকায় রাজধানী এবং চট্টগ্রামে নৌবন্দর স্থাপিত হওয়ায় পূর্ববঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। রাস্তাঘাট নির্মাণের ফলেও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার জনগণ উন্নতি করতে থাকে। তার ফলে এ অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি সাধিত হয়।

১২. শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন: বঙ্গভঙ্গের পর 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের শিক্ষার উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। উচ্চ শিক্ষার উন্নয়নে সিলেট মুরারি চাঁদ কলেজকে সরকারিকরণ, জগন্নাথ কলেজকে প্রথম শ্রেণিতে উন্নীতকরণ, বেসরকারি কলেজগুলোতে অনুদান প্রদান, মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়ন এবং নতুন নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – ব্রিটিশ-ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ ও ভারত বিভাগ

টপিক – ১০ স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৩-১৯০৮)

টপিক ১০: স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৩-১৯০৮)

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৩-১৯০৮)

১৯০২ সালে লর্ড কার্জন ভারত সচিবকে লিখেছিলেন যে, 'একটি মাত্র কেন্দ্র থেকে এত বড় ও বিশাল জনবহুল এলাকা শাসন করা সম্ভব নয়'। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা জানাজানি হবার পর থেকেই ভারতের জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস নেতাগণ আইরিশ জাতীয়তাবাদীদের অনুকরণে ব্রিটিশ দ্রব্য বর্জন, বিদেশি রীতিনীতি ও আদর্শ পরিহারের পাশাপাশি স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার এবং দেশীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে জনগণকে আহ্বান জানান। ১৯০৫ সালের ১৩ জুলাই কলকাতার সাপ্তাহিক 'গণজীবনী'র সম্পাদক কৃষ্ণ কুমার মিত্র 'বয়কট' বা বর্জনের ডাক দেন। ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কলকাতার টাউন হলে এক বিরাট প্রতিবাদ সভায় এই 'বয়কট' বা 'বর্জন নীতি' গৃহীত হয়। এরপরও লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা প্রদান এবং ১৫ অক্টোবর থেকে তা কার্যকর করেন। এর প্রতিবাদে বয়কট বা বর্জন আন্দোলন আরো দূর্বার হয়ে উঠে। উগ্রপন্থী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায়, বিপিন চন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখের সক্রিয় চেষ্টায় তা জাতীয় গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। এই আন্দোলন ইতিহাসে 'স্বদেশী আন্দোলন' নামে খ্যাত।

স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৩-১৯০৮)

স্বদেশী আন্দোলনকারীরা ব্রিটিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। তবে ব্রিটিশ পণ্য বিশেষত বস্ত্র, লবণ, চিনি, সিগারেট এবং বিলাস সামগ্রী বর্জনের পিছনে যেমন একটি অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল তেমনি এর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল। তা হলো দেশকে স্বনির্ভরশীল করে তোলা এবং বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করতে ব্রিটিশ সরকারকে বাধ্য করা। স্বদেশী আন্দোলনকারীরা ঠিকই ধরে নিয়েছিলেন যে, বয়কট বা বর্জন আন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্ত ব্রিটিশ বস্ত্রশিল্প এবং বিলাস সামগ্রী উৎপাদনকারী শিল্প-মালিকরা ব্রিটিশ সরকারকে বঙ্গবঙ্গ রদ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করবে।

স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৩-১৯০৮)

স্বদেশী ও বর্জন আন্দোলন অতি দ্রুত গণজাগরণের সৃষ্টি করে। এই আন্দোলন বাঙালি জাতির জীবনে নতুন দিগন্তের উন্মেষ ঘটায়। জাতীয় জীবনে দেশপ্রেমের প্রবল জোয়ার সৃষ্টি হয়। দেশে নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। 'জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন' সারা ভারতে বিশেষ করে বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর 'বেঙ্গলী', মতিলাল ঘোষের 'অমৃতবাজার' পত্রিকাসহ অন্যান্য পত্র-পত্রিকা ও বুদ্ধিজীবীদের লেখনি স্বদেশী আন্দোলনকে আরো বেগবান করে তোলে। স্বদেশী আন্দোলন ক্রমশ 'স্বরাজ' আন্দোলনে পরিণত হয়। এর পাশাপাশি বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরেজ সরকারের পতন ঘটানোরও প্রচেষ্টা শুরু হয়। ঢাকা ও কলকাতাকে কেন্দ্র করে বিপ্লব সংঘ ও গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে। বিপ্লবীরা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলে। এসব কর্মকাণ্ডের ফলে ১৯১১ সালে ব্রিটিশ শাসকরা বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – ব্রিটিশ-ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ ও ভারত বিভাগ

টপিক – ১১ বঙ্গভঙ্গ রদ

টপিক ১১: বঙ্গভঙ্গ রদ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বঙ্গভঙ্গ রদ

ব্রিটিশ বিরোধী দুর্বার গণআন্দোলনের ফলে শঙ্কিত ব্রিটিশ সরকার ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করে। বঙ্গভঙ্গ রদের কারণ (Causes of the Annulment of the Partition of Bengal) নিম্নলিখিত কারণে ব্রিটিশ সরকার ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদ করে।

১. গণআন্দোলন: ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ হিন্দু মধ্যবিত্ত লেখক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, চাকরিজীবী ও নেতাদেরকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। তারা বঙ্গভঙ্গকে 'বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদের সমতুল্য' বলে প্রচার করতে থাকেন। এটাকে তাঁরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ধ্বংসের ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করেন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, বিপিন চন্দ্র পাল, বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতাদের নেতৃত্বে প্রথমে পশ্চিম বাংলায় এবং পরে সমগ্র ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী দুর্বার গণআন্দোলনের সৃষ্টি হয়। ব্রিটিশ শাসন অচল হয়ে পড়ার উপক্রম হয়। বাধ্য হয়ে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করার চিন্তাভাবনা শুরু করে।

বঙ্গভঙ্গ রদ

২. সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ: ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের ফলে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির একাংশ মনে করে যে, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন করে ব্রিটিশ সরকারকে বঙ্গভঙ্গ রদে বাধ্য করা যাবে না। তাঁরা গোপনে যুগান্তর, অনুশীলনী প্রভৃতি ব্রিটিশ বিরোধী সন্ত্রাসী গোষ্ঠী বা সংঘ গড়ে তোলে। বিভিন্ন স্থানে এ সন্ত্রাসী গোষ্ঠী উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্মকর্তা এবং ব্রিটিশ শাসকদের সমর্থক বা সহায়তাদানকারী ভারতীয় কর্মকর্তাদের প্রাণনাশের চেষ্টা চালায়। ১৯১০ সালের ১৪ জানুয়ারি সন্ত্রাসীদের হাতে পুলিশের ডি. আই. জি. খানবাহাদুর সামসুল আলম গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। ফলে ব্রিটিশ সরকার শঙ্কিত হয়ে পড়ে। তাঁরা পুনরায় বিভক্ত বঙ্গপ্রদেশকে একত্রীকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জের দিল্লিতে অনুষ্ঠিত অভিষেক অনুষ্ঠানে রাজকীয় ঘোষণাবলে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয় এবং পূর্ববঙ্গকে পশ্চিমবঙ্গের সাথে পুনরায় একত্রিত করা হয়।

বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়া

বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে হিন্দু ও মুসলমান জনগণের মধ্যে বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। এ প্রতিক্রিয়া ছিল নিম্নরূপ:

হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া

Reaction of Hindu Comunity

ব্রিটিশ সরকার ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা করায় হিন্দু জনগণ উল্লসিত হয়ে ওঠে। কেননা বঙ্গভঙ্গ রদ হবার ফলে এবং পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ একত্রিত হওয়ায় কলিকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু জনগণ তাদের হারানো প্রভাব প্রতিপত্তি ফিরে পায়। ব্যবসায়িগণ উল্লসিত হন এ কারণে যে, আবারো কলিকাতা সমগ্র বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হবে। আইনজীবীগণ ভাবলেন, তাঁদের পূর্ব বাংলার মক্কেলরা আবার কলকাতায় ছুটে আসবে। এক কথায় বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ায় কলিকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু নেতা, ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবীগণ তাদের হারানো গৌরব ও প্রভাব প্রতিপত্তি ফিরে পান।

বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়া

মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া

Reaction of Musalman Comunity

১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার ঘোষণা শুনে মুসলমান অভিজাত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বিস্ময়-বিমূঢ় ও হতাশ হয়ে পড়ে। 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামক নতুন প্রদেশ গঠিত হওয়ায় তাদের মধ্যে যে উৎসাহ, প্রাণচাঞ্চল্য ও জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল, বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা তা স্তব্ধ করে দেয়। নবগঠিত প্রদেশকে ঘিরে তাদের রচিত সব সুখ স্বপ্ন ভেঙে যায়। এর ফলে পূর্ব বাংলার মুসলমান জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ সরকারের ওপর থেকে মুসলমান জনগণ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। কংগ্রেস এবং অন্যান্য সংগঠনের নেতাগণ যখন বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য আন্দোলন করছিলেন তখন লর্ড মিন্টো কমন্সসভায় ঘোষণা করেছিলেন যে, "আমরা মুসলমান জনগণকে বলেছিলাম বঙ্গভঙ্গ একটি মীমাংসিত ঘটনা (settled fact) এবং বার বার জোর দিয়েছি যে, এ সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত থাকবে।" বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ায় হিন্দুদের স্বার্থে মুসলমান জনগণের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের বিশ্বাসঘাতকতা নগ্নরূপে ফুটে ওঠে। এর ফলে ব্রিটিশ সরকারের উপর মুসলমানদের আস্থা বিনষ্ট হয়। নবাব স্যার সলিমুল্লাহসহ অনেক মুসলমান নেতাই ব্রিটিশ সরকারের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন। অপরদিকে পূর্ব-বাংলার মুসলমান জনগণ হিন্দু জনগণকেও অবিশ্বাস করতে শুরু করে।

বঙ্গভঙ্গ রদের ফলাফল

বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ায় ভারতীয় উপমহাদেশে বিশেষ করে বাংলার হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়। সাম্প্রদায়িকতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রসার লাভ করে। ধর্মকেন্দ্রিক জাতীয়তার বীজ অঙ্কুরিত হয়।

বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের ফলে মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। মুসলমান জনগণ বুঝতে সক্ষম হয় যে, আপস নয় বরং সংগ্রামের পথেই তাদেরকে উন্নতি ও স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হতে হবে। মুসলমান জনগণ তাঁদের রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণে আরো তৎপর হয়ে উঠতে থাকে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

টপিক – ১২ ১৯০৬ সালে ‘নিখিল ভারত মুসলিম লীগ’ প্রতিষ্ঠা এবং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

টপিক ১২: ১৯০৬ সালে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠা এবং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

১৯০৬ সালে ‘নিখিল ভারত মুসলিম লীগ’ প্রতিষ্ঠা এবং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

পটভূমি : ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর ভারতবর্ষের মুসলমান নেতৃবৃন্দ তাঁদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য একটি রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করতে থাকেন। ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী মুসলিম প্রতিনিধি দল লর্ড মিন্টোর নিকট 'পৃথক নির্বাচনের' দাবি জানালে তিনি তা নীতিগতভাবে মেনে নেন। এর ফলে মুসলিম নেতৃবৃন্দ উৎসাহিত হয়ে পড়েন। ১৯০৬ সালে ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে ঢাকায় 'নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। এ শিক্ষা সম্মেলনে বসে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের প্রশ্নে মুসলমান নেতৃবৃন্দ মতবিনিময় করেন। ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর নবাব ভিকারুল মুলকের সভাপতিত্বে এক বিশেষ অধিবেশনে ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ একটি সর্বভারতীয় মুসলিম রাজনৈতিক দল গঠনের প্রস্তাব রাখেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এভাবেই “সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ” নামক একটি রাজনৈতিক সংগঠনের জন্ম হয়।

মুসলিম লীগের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য

১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠালগ্নে এর তিনটি লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের কথা ঘোষণা করা হয়। এগুলো হলো:

১। ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভারতের মুসলমান জনগণের আনুগত্য বৃদ্ধি করা এবং ব্রিটিশ সরকার গৃহীত কোনো ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের কোনো ভুল ধারণার সৃষ্টি হলে তা দূর করা।

২। ভারতীয় মুসলমান জনগণের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ, উন্নতি সাধন এবং তাদের প্রয়োজন ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বিনয়ের সাথে ব্রিটিশ সরকারকে অবহিত করা।

৩। মুসলিম লীগের উপরোক্ত উদ্দেশ্য দুটি অব্যাহত রাখার পাশাপাশি ভারতীয় অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি মুসলমান জনগণের মধ্যে যেন বিদ্বেষ ভাব সঞ্চার না হয় তার ব্যবস্থা করা। মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতাগণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার জন্য পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ব্রিটিশরাজের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখেই মুসলিম লীগ নেতাগণ মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য সচেষ্ট হন।১৫ ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের জন্মের পর থেকে দীর্ঘদিন এ সংগঠনটি ব্রিটিশরাজের অনুগত ছিল। দীর্ঘদিন ব্রিটিশ শাসকদের ধামাধরা জমিদার-তালুকদাররা এ দলের নেতৃত্বে ছিলেন।

১৯০৬ সালে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠা এবং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মুসলিম লীগ-এর কার্যক্রম

১৯০৬ সালে ব্রিটিশ ভারতে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কেননা এটি ছিল সত্যিকার অর্থে এ উপমহাদেশে মুসলমানদের দ্বারা গঠিত সর্বপ্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। নিম্নে মুসলিম লীগের কার্যক্রম ও পদক্ষেপসমূহ উল্লেখ করা হলো:

১। ব্রিটিশ সরকারের নিকট দাবি-দাওয়া ও আশা-আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরা: ১৯০৬ সালের পূর্বে মুসলমান জনগণ ছিল অসংগঠিত। তাঁদের চাওয়া-পাওয়া ব্রিটিশ সরকারকে জানানোর জন্য কোনো সংগঠন বা প্লাটফর্ম ছিল না। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের জন্ম হলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মুসলমান সম্প্রদায় তাদের চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্রিটিশ সরকারকে যথাসময়ে জানাতে সক্ষম হয়।

২। পৃথক নির্বাচনের দাবি: ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর মহামান্য আগাখানের নেতৃত্বে একটি মুসলিম প্রতিনিধিদল সিমলায় বড়লাট লর্ড মিন্টোর সাথে সাক্ষাৎ করে অন্যান্য দাবি দাওয়ার সাথে 'পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা' প্রবর্তনের দাবি জানায়। মুসলিম লীগ পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সপক্ষে বিভিন্ন ফোরামে আবেদন-নিবেদন ও আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকে। ফলে '১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টোর সংস্কার আইনে' মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।

৩। দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কংগ্রেসের সাথে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে আগ্রহ প্রকাশ: কংগ্রেসের ব্রিটিশ বিরোধী স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন ও দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রতি মৌলানা শওকত আলী, মৌলানা মোহাম্মদ আলী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ প্রভাবশালী মুসলমানের আগ্রহ ও সমর্থন মুসলিম লীগকেও দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয় হতে উদ্বুদ্ধ করে। এ সময়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ১৯১৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর নিজ নিজ দলের বার্ষিক অধিবেশন লক্ষ্ণৌ শহরে আহ্বান করে। উভয় দল 'লক্ষ্ণৌচুক্তি' প্রণয়ন করে ঐক্যবদ্ধভাবে স্বায়ত্তশাসন ও দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চালিয়ে যেতে ঐকমত্য পোষণ করে। লক্ষ্ণৌচুক্তি হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি ও সমঝোতার এক মহাসুযোগ সৃষ্টি করে।

৪। জিন্নাহর চৌদ্দ দফা ও মুসলমান জনগণের স্বার্থরক্ষার একক প্রচেষ্টা: ১৯২৯ সালে প্রকাশিত নেহরু রিপোর্টে মুসলমান জনগণের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়েছে বলে মুসলিম লীগ দাবি করে। মুসলমান জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণে এরপর মুসলিম লীগ একক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ 'নেহেরু রিপোর্টের' প্রতিবাদে মুসলিম লীগের পক্ষে তাঁর নিজস্ব '১৪-দফা প্রস্তাব' বা দাবি-দাওয়া পেশ করেন।

৫। 'সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা' প্রবর্তনের ধারণা প্রত্যাখ্যান: ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দিক ছিল ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশসমূহ এবং দেশীয় রাজ্যগুলোর সমন্বয়ে একটি 'সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র' (All-India Federation) গঠনের পরিকল্পনা। মুসলিম লীগ উপলব্ধি করে যে, মুসলমান জনগণ যদি এক জাতি তত্ত্বের অধীনে এ ব্যবস্থায় সম্মত হয় তাহলে ভবিষ্যতে তারা নিজেদের জন্য পৃথক আবাসভূমি গঠন করতে পারবে না। মুসলিম লীগের এ উপলব্ধির ফলেই মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমি গঠনের চিন্তাভাবনা ত্বরান্বিত হতে থাকে।

৬। দ্বি-জাতি তত্ত্ব ও লাহোর প্রস্তাব: মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ হিন্দু-মুসলিম জনগণের ক্রম অবনতিশীল ও তিক্ত সম্পর্কের দিকে লক্ষ রেখে তাঁর 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' (Two Nations theory) প্রকাশ করেন। ১৯৪০ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের সম্মেলনে ২৩ মার্চ শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তাতে দ্বি-জাতি তত্ত্বকেই সমর্থন জানানো হয়। ঐতিহাসিক এ "লাহোর প্রস্তাবে" ব্রিটিশ ভারতে 'একাধিক মুসলিম রাষ্ট্র' (STATES) গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব পাসের পর মুসলিম লীগ 'পাকিস্তান' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অনড় অবস্থান গ্রহণ করে। মুসলিম লীগের এ দৃঢ় ও অনড় অবস্থানের কারণে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট 'পাকিস্তান' নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র জন্মলাভ করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – ব্রিটিশ-ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ ও ভারত বিভাগ

টপিক – ১৩ ভারতীয় কাউন্সিল আইন, ১৯০৯ বা মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন

টপিক ১৩: ভারতীয় কাউন্সিল আইন, ১৯০৯ বা মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

ভারতীয় কাউন্সিল আইন, ১৯০৯ বা মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন

পটভূমি: ভারতীয় কাউন্সিল আইন, ১৮৬১ ও ভারতীয় কাউন্সিল আইন, ১৮৯২ এর মধ্যে বেশকিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি বা সীমাবদ্ধতা থাকায় তা ভারতীয় জনগণকে পুরোপুরি সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় হিসেবে লর্ড কার্জনের শাসনামলে তিনি এমন কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকর করেছিলেন যা বিতর্ক ও আলোড়নের সৃষ্টি করে।লর্ড কার্জনের এসব সিদ্ধান্ত ভারতীয় জনগণের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষের সৃষ্টি করে।

উপরিউক্ত অবস্থার প্রেক্ষাপটে ইংরেজ শাসকগণ সাংবিধানিক সংস্কার সাধন করে ভারতীয় জনগণের দাবি পূরণ ও তাদের অসন্তোষ দূর করার জন্য বড়লাট ও ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সাথে ভারত সচিব লর্ড মর্লির মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে পত্রালাপ চলে। এসব আলোচনা পর্যালোচনার আলোকে ১৯০৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর লর্ড মর্লি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ লর্ডসভায় একটি "ভারতীয় পরিষদ বিল" উপস্থাপন করেন। ১৯০৯ সালের ২৫ মে বিলটি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে পাস হলে তা আইনে (Act) পরিণত হয়। এ আইনটি "১৯০৯ সালের ভারতীয় কাউন্সিল বা পরিষদ আইন" (The Indian Councils Act, 1909) বা "মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন" (Morley-Minto Reforms Act) নামে পরিচিত হয়।

ভারতীয় কাউন্সিল আইন, ১৯০৯ বা মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন

মূল ধারা বা বৈশিষ্ট্যসমূহ: মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইনের মূল ধারা বা বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল নিম্নরূপ:
১। প্রতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থার প্রবর্তন: ১৯০৯ সালের ভারতীয় পরিষদ আইনের মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতে সর্বপ্রথম প্রতিনিত্বিশীল (Representative System) ব্যবস্থার সূচনা ঘটে।
২। পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার প্রবর্তন: এ আইনে ভারতবর্ষের মুসলমানদের জন্য সর্বপ্রথম 'পৃথক নির্বাচন' বা প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার (Separate Electorate) প্রবর্তন করা হয়। এর ফলে মুসলমান জনপ্রতিনিধিগণ মুসলমান নির্বাচক (Voter) দ্বারা নির্বাচিত হবার সুযোগ লাভ করেন।
৩। সংখ্যা সাম্যনীতি: এ আইন দ্বারা স্থির হয় যে, যেসব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেসব প্রদেশের আইনসভায় তারা নিজেদের জনসংখ্যার তুলনায় কম আসন পাবেন। আবার যেসব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘিষ্ঠ সেসব প্রদেশের আইনসভায় তারা নিজেদের জনসংখ্যার তুলনায় বেশি আসন লাভ করবেন। এছাড়াও বলা হয় যে, কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমানরা নির্বাচিত আসনের এক-তৃতীয়াংশ লাভ করবেন।

ভারতীয় কাউন্সিল আইন, ১৯০৯ বা মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন

৪। সীমিত ভোটাধিকার: এ আইন দ্বারা 'সীমিত ভোটাধিকার' (Restricted Franchise) ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ এবং প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণকে ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকার প্রদান না করে তা শুধুমাত্র ভূস্বামী, বণিক সমিতি, পেশাজীবী সংগঠন, পৌরসভা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটর প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য সংরক্ষিত বা সীমিত করে দেয়া হয়।

৫। নির্বাচন ব্যবস্থার স্বীকৃতি প্রদান: এ আইন দ্বারা সর্বপ্রথম সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন ব্যবস্থা (Election System) প্রবর্তন করা হয়। তবে এ আইনে নির্বাচনের পাশাপাশি মনোনয়ন ব্যবস্থাও (Nomination System) বহাল রাখা হয়।

৬। নির্বাচন পদ্ধতি: এ আইন দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ (Direct and Indirect election) নির্বাচন পদ্ধতি চালু করা হয়।

৭। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ: এ আইনে সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্যসংখ্যা ১৬ জন থেকে বাড়িয়ে ৬৯ জনকরা হয়। ৬৯ জন সদস্যের মধ্যে ৩৭ জন হবেন সরকারি সদস্য এবং ৩২ জন হবেন বেসরকারি সদস্য। ৩৭ জন সরকারি সদস্যের মধ্যে ২৮ জন গভর্নর জেনারেল কর্তৃক মনোনীত হবেন এবং বাকি ৯ জন হবেন স্বয়ং গভর্নর জেনারেল, তাঁর নির্বাহী পরিষদের ৭ জন সদস্য এবং ১ জন বিশেষ সদস্য। বেসরকারি ৩২ জন সদস্যের মধ্যে ৫ জন গভর্নর জেনারেল কর্তৃক মনোনীত হবেন। বাদবাকি ২৭ জন বেসরকারি নির্বাচিত হবেন।

৮। প্রাদেশিক আইন পরিষদ: এ আইনে প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলোর সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। বাংলা প্রদেশে ৫২ জন এবং বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশে প্রতি প্রদেশে ৪৭ জন সদস্য থাকবে বলে বিধান করা হয়। প্রদেশের আইন সভাগুলোতে সরকারি সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতার অবসান ঘটানো হয় এবং বেসরকারি সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রদান করা হয়।

ভারতীয় কাউন্সিল আইন, ১৯০৯ বা মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন

পটভূমি: ভারতীয় কাউন্সিল আইন, ১৮৬১ ও ভারতীয় কাউন্সিল আইন, ১৮৯২ এর মধ্যে বেশকিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি বা সীমাবদ্ধতা থাকায় তা ভারতীয় জনগণকে পুরোপুরি সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় হিসেবে লর্ড কার্জনের শাসনামলে তিনি এমন কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকর করেছিলেন যা বিতর্ক ও আলোড়নের সৃষ্টি করে।লর্ড কার্জনের এসব সিদ্ধান্ত ভারতীয় জনগণের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষের সৃষ্টি করে।

উপরিউক্ত অবস্থার প্রেক্ষাপটে ইংরেজ শাসকগণ সাংবিধানিক সংস্কার সাধন করে ভারতীয় জনগণের দাবি পূরণ ও তাদের অসন্তোষ দূর করার জন্য বড়লাট ও ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সাথে ভারত সচিব লর্ড মর্লির মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে পত্রালাপ চলে। এসব আলোচনা পর্যালোচনার আলোকে ১৯০৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর লর্ড মর্লি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ লর্ডসভায় একটি "ভারতীয় পরিষদ বিল" উপস্থাপন করেন। ১৯০৯ সালের ২৫ মে বিলটি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে পাস হলে তা আইনে (Act) পরিণত হয়। এ আইনটি "১৯০৯ সালের ভারতীয় কাউন্সিল বা পরিষদ আইন" (The Indian Councils Act, 1909) বা "মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন" (Morley-Minto Reforms Act) নামে পরিচিত হয়।

৯। আইনসভার ক্ষমতা বৃদ্ধি: এ আইনে আইন পরিষদগুলোর ক্ষমতা ও কার্যাবলি কিছুটা সম্প্রসারিত হয়। আইন পরিষদের সদস্যগণকে যেকোনো প্রশ্ন, সম্পূরক প্রশ্ন ও জনস্বার্থ বিষয়ক প্রস্তাব উত্থাপনের ক্ষমতা প্রদান করা হয় এবং এগুলোর উপর ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়।১৭

১০। বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশের গভর্নরের নির্বাহী পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি: এ আইন দ্বারা মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের গভর্নরের 'নির্বাহী পরিষদের' (Executive Council) সদস্যসংখ্যা ২ জন থেকে বৃদ্ধি করে ৪ জনে উন্নীত করার ক্ষমতা 'স্বপরিষদ ভারত সচিব'কে (Secretary of State-in-Council) প্রদান করা হয়।

১১। গভর্নর জেনারেলের নির্বাহী পরিষদে ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্তি: এ আইনের মাধ্যমে সর্বপ্রথম গভর্নর জেনারেলের নির্বাহী পরিষদের আইন বিষয়ক সদস্য হিসেবে ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্ত করার বিধান করা হয়।

১২। শ্রেণি ও স্বার্থগত প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা: এ আইনে 'আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের' (Territorial Representation) পরিবর্তে 'শ্রেণি ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের' দাবি স্বীকৃত হয়। কেননা এ আইনে স্পষ্টভাবে বলা হয় যে, নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হবে জেলা বোর্ড, পৌরসভা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বৃহৎ ভূস্বামী প্রভৃতি বিশেষ শ্রেণি বা গোষ্ঠী কর্তৃক।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – ব্রিটিশ-ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ ও ভারত বিভাগ

টপিক – ১৪ ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন বা মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন

টপিক ১৪: ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন বা মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন বা মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন

পটভূমি: ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীদের সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করে। ভারতে তখন স্বায়ত্তশাসন অর্জনের জন্য আন্দোলন চলছিল। স্বায়ত্তশাসন প্রদানের অঙ্গীকারের বিনিময়ে ভারতবাসিগণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সহযোগিতা প্রদান করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। এ প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ভারত সচিব মন্টেগু ভারতবর্ষে আসেন এবং বড়লাট মি. চেমসফোর্ডের সাথে ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক রূপরেখা সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁদের গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ 'ভারত শাসন আইন' নামে বিল আকারে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পেশ করা হলে ১৯১৯ সালে তা পাস হয়। এ আইনকে '১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন' বা 'মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন' বলা হয়।

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন বা মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন

ধারা বা বৈশিষ্ট্যসমূহ: এ আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো হলো:

১. ক্ষমতা ও বিষয় বণ্টন: শাসন বিভাগীয় কার্যাবলি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ভাগ করা হয়। কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা, ডাক, তার ও রেল যোগাযোগ, মুদ্রা, ব্যাংক, বাণিজ্য ইত্যাদি। প্রাদেশিক বিষয়ের মধ্যে ছিল আইন-শৃঙ্খলা, বিচার, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সমবায়, কৃষি, সেচ, ভূমিকর, বন ইত্যাদি।

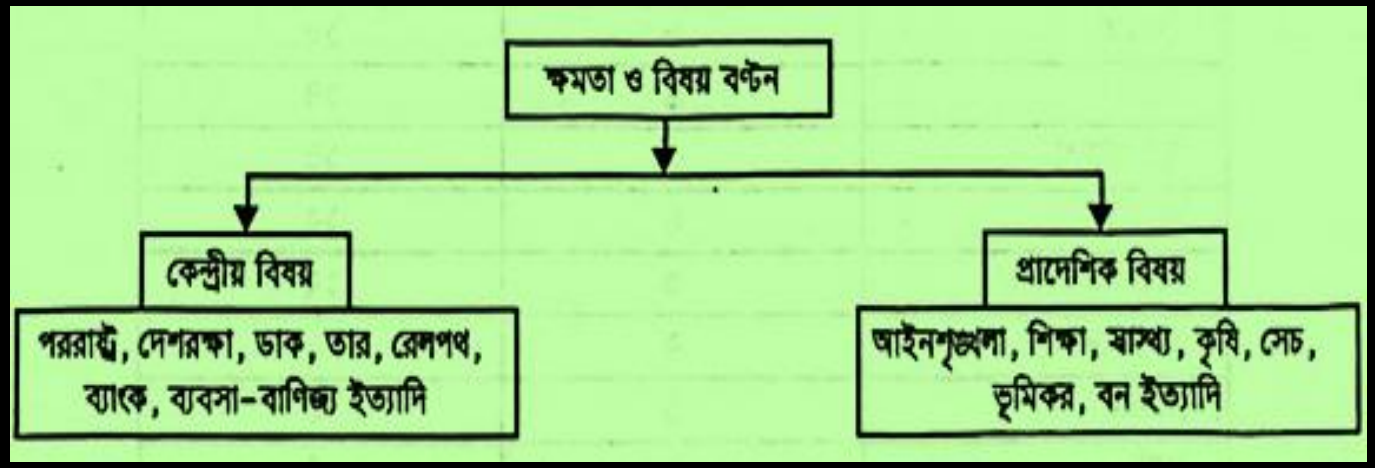

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন বা মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন

২. প্রদেশে দ্বৈতশাসন: এ আইনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, প্রদেশে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা (Dyarchy) প্রতিষ্ঠা। প্রাদেশিক শাসন সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে 'সংরক্ষিত' (Reserved) ও 'হস্তান্তরিত' (Transferred)-এ দু ভাগে ভাগ করা হয়। 'হস্তান্তরিত' বিষয়গুলো ছিল কম গুরুত্বপূর্ণ। এসব হস্তান্তরিত বিষয় প্রাদেশিক গভর্নরগণ প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালনা করতেন। মন্ত্রিগণ প্রাদেশিক আইন পরিষদের নিকট তাঁদের কার্যাবলির জন্য দায়ী থাকতেন। কিন্তু 'সংরক্ষিত' বিষয়গুলো গভর্নর সরাসরি 'শাসন পরিষদের' সহায়তায় শাসন করতেন বা পরিচালনা করতেন। গভর্নর ও শাসন পরিষদের সদস্যগণ এক্ষেত্রে আইনসভার নিকট দায়ী ছিলেন না।

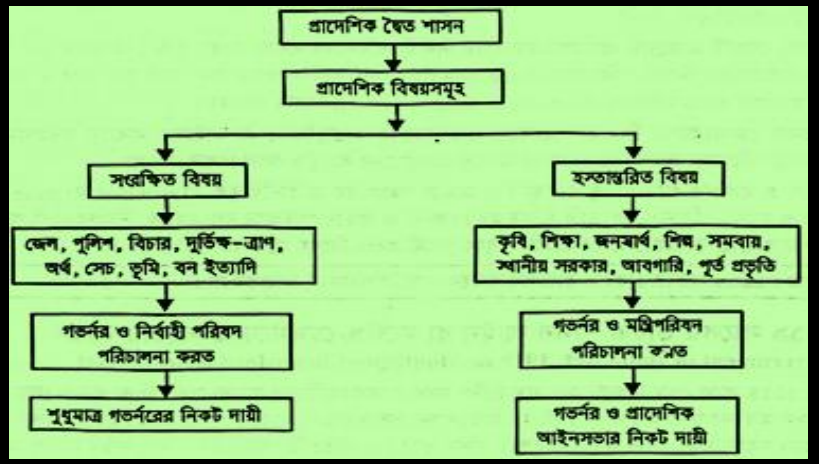

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন বা মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন

৩. দ্বিকক্ষবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় আইনসভা: এ আইনে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ সৃষ্টি করা হয়। উচ্চ কক্ষের নাম হয় রাজ্যসভা বা 'রাষ্ট্রীয় সভা'। এর সদস্য সংখ্যা ছিল ৬০ জন। এর মধ্যে ৩৪ জন হবেন নির্বাচিত এবং বাকি ২৬ জন মনোনীত। নিম্নকক্ষের নাম হয় 'ব্যবস্থাপক সভা'। এর সদস্যসংখ্যা ছিল ১৪৫ জন। এর মধ্যে ১০৪ জন ছিলেন নির্বাচিত এবং অবশিষ্ট ৪১ জন সরকার মনোনীত।

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রদেশভিত্তিক আসন বিন্যাস

প্রদেশ	রাজ্যসভা	ব্যবস্থাপক সভা
মাদ্রাজ	৫	১৬
বোম্বাই	৬	১৬
বাংলা	৬	১৭
যুক্ত প্রদেশ	৫	১৬
পাঞ্জাব	৪	১২
বিহার ও উড়িষ্যা	৩	১২
মধ্যপ্রদেশ	২	৬
আসাম	১	৪
বার্মা	২	৪
দিল্লি	-	১
মোট	৩৪	১০৪

৪. সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন আইনসভা: এ আইন অনুযায়ী গভর্নর জেনারেল ইচ্ছা করলে আইনসভার কোনো পক্ষের মতামত না নিয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারতেন। কর ধার্য ও ব্যয় নির্ধারণের ক্ষেত্রেও তাঁর ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। সুতরাং আইনসভা ছিল সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন।

৫. গভর্নর জেনারেলের শাসন পরিষদ: গভর্নর জেনারেলকে সহায়তা করার জন্য ৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি 'শাসন পরিষদ' গঠন করা হয়। শাসন পরিষদের সদস্যদের মধ্যে ৩ জন ছিলেন ভারতীয় এবং তাঁরা আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন। বাদবাকি ৪ জন ইংরেজ সদস্যদের দ্বারা মনোনীত হতেন।

৬. সংসদীয় সরকার: এ আইনে প্রদেশগুলোতে সীমিত আকারে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।

৭. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন: এ আইনে প্রদেশগুলোতে আংশিক ও সীমিত পরিসরে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হয়।

৮. প্রাদেশিক গভর্নর প্রদেশ শাসনে প্রাদেশিক গভর্নরের ক্ষমতা ছিল সীমাহন। তিনি প্রাদেশিক মন্ত্রিপরিষদের অনেক সিদ্ধান্তকেই অগ্রাহ্য করতে পারতেন। বিশেষ করে সংরক্ষিত বিষয়ে গভর্নর এবং তাঁর শাসন পরিষদই ছিল সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

৯. প্রাদেশিক আইনসভা: প্রাদেশিক আইনসভাগুলো গঠিত হতো সত্তর ভাগ নির্বাচিত এবং ত্রিশ ভাগ সরকার মনোনীত সদস্য নিয়ে। মনোনীত সদস্যদের ২০% হতেন সরকারি সদস্য। আইনসভার মেয়াদ ছিল তিন বছর। সংরক্ষিত বিষয়ের কোনো ব্যয় আইনসভা কর্তৃক পাস না হলেও গভর্নর নিজ দায়িত্বে তা পাস করিয়ে নিতে পারতেন।

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক আইনসভার আসন বিন্যাস

প্রদেশ	বিধিবদ্ধ ন্যূনতম	নির্বাচিত	মনোনীত ও পদাধিকারবলে			মোট
			সরকারি	বেসরকারি	শাসন পরিষদ সদস্য	
মাদ্রাজ	১১৮	৯৮	৭	২৩	৪	১৩২
বোম্বাই	১১১	৮৬	১৫	৯	৪	১১৪
বাংলা	১২৫	১১৪	১২	১০	৪	১৪০
যুক্ত প্রদেশ	১১৮	১০০	১৫	৬	২	১২৩
পাঞ্জাব	৮৩	৭১	১৩	৮	২	৯৪
বিহার ও উড়িষ্যা	৯৮	৭৬	১৩	১২	২	১০৩
মধ্যপ্রদেশ	৭০	৫৩	৮	৮	২	৭৩
আসাম	৫৩	৩৯	৫	৭	২	৫৩
বার্মা	৯২	৮০	১৪	৭	২	১০৩

১০. পৃথক নির্বাচন : ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে ভারতের বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য 'পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা' গৃহীত হয়।

১১. উপদেষ্টা বোর্ড গঠন: এ আইন বলবৎ হবার দশ বছর পরে শাসনব্যবস্থার কার্যকারিতা পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ পেশ করার জন্য একটি বিধিবদ্ধ কমিশন ও উপদেষ্টা বোর্ড গঠনের বিধান করা হয়।

১২. ভারত সচিবের ক্ষমতা বৃদ্ধি: ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে ভারত সচিবের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। তার হাতে এত বেশি ক্ষমতা অর্পণ করার ফলে তাকে 'হোয়াইট হলের পরাক্রমশালী মুঘল সম্রাট' বলে অভিহিত করা হতো।

১৩. কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া: এ আইনে কিছু কিছু ভারতীয় সদস্য নিয়ে ১২ সদস্যবিশিষ্ট 'কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া' গঠিত হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – ব্রিটিশ-ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ ও ভারত বিভাগ

টপিক – ১৫ দ্বৈতশাসন

টপিক ১৫: দ্বৈতশাসন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

দ্বৈতশাসন

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন দ্বারা ব্রিটিশ-ভারতীয় প্রদেশগুলোতে 'দ্বৈতশাসন' প্রবর্তন করা হয়। ব্রিটিশ-ভারতীয় প্রদেশগুলোতে দ্বৈতশাসন প্রবর্তনের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

দ্বৈতশাসনের অর্থ : 'দ্বৈতশাসন' বলতে কোনো প্রশাসনে দুটি কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিকে বোঝায়। সাধারণত এরূপ ক্ষেত্রে প্রশাসনিক বিষয়সমূহকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং এগুলো পরিচালনার জন্য দু ধরনের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি করা হয়। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন দ্বারা প্রদেশগুলোতে এরূপ দ্বৈতশাসন প্রবর্তন করা হয়েছিল। প্রাদেশিক সরকারের প্রশাসনিক বিষয়গুলোকে 'সংরক্ষিত' ও 'হস্তান্তরিত'-এ দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। বিচারবিভাগ ভূমিরাজস্ব, পুলিশ, জেল, ভূমির উন্নয়ন ও কৃষিঋণ, ত্রাণ, সেচ, সংবাদপত্র ও প্রকাশনা নিয়ন্ত্রণ, বনজ শিল্প, বিমা শিল্প, গৃহনির্মাণ ঋণদান, শ্রমিক সমস্যার সমাধান, খাল খনন ও বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতি সংরক্ষিত বিষয় পরিচালনার দায়িত্ব গভর্নর ও তাঁর কার্যনির্বাহী পরিষদের উপর ন্যস্ত হয়।

দ্বৈতশাসন

অপরদিকে কৃষি, শিক্ষা, সমবায়, মৎস্য, স্থানীয় সরকার, জনস্বাস্থ্য, জনকল্যাণমূলক কাজ প্রভৃতি হস্তান্তরিত বিষয়ের পরিচালনার ভার গভর্নর ও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার উপর ন্যস্ত হয়। প্রাদেশিক গভর্নর হস্তান্তরিত বিষয় পরিচালনার ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার উপদেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হতেন।

দ্বৈতশাসন

প্রতিশ্রুত দায়িত্বশীল সরকারের স্বরূপ বা দ্বৈতশাসনের ব্যর্থতার কারণ: নানা কারণে দ্বৈতশাসন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এর জন্য নিম্নলিখিত কারণগুলো দায়ী ছিল :

১। কৃত্রিম বিভাজন : প্রাদেশিক সরকারের বিষয়গুলোকে কৃত্রিমভাবে গঠিত দুটি সংস্থার হাতে অর্পণ করার ফলে সরকারের স্বাভাবিক কর্মপ্রবাহ বিঘ্নিত হয়। কেননা এর ফলে মন্ত্রিপরিষদ এবং গভর্নরের কার্যনির্বাহী পরিষদ একে অপরকে সহায়ক ও পরিপূরক না ভেবে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে শুরু করে।

২। মন্ত্রিসভার দায়িত্বহীনতা: মন্ত্রিসভার সদস্যগণ তাদের কাজের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আইনসভার নিকট দায়ী ছিলেন। কেননা গভর্নর মন্ত্রীদের সাথে যৌথভাবে পরামর্শের পরিবর্তে ব্যক্তিগতভাবে পরামর্শ করতেন। মন্ত্রীদের যৌথ দায়িত্বশীলতা না থাকায় সংসদীয় গণতন্ত্রের ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

৩। দলীয় রাজনীতির অনুপস্থিতি: দলব্যবস্থা সংসদীয় ও দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থার অন্যতম পূর্বশর্ত। কিন্তু দ্বৈতশাসন কার্যকরী করার সময় ভারতে এরূপ দলব্যবস্থা ছিল না। মন্ত্রিগণ যৌথভাবে নিযুক্ত না হয়ে ব্যক্তিগতভাবে নিযুক্ত হতেন এবং সরকারি সদস্যদের উপর নির্ভরশীল থাকতেন। ফলে মন্ত্রীদের ক্ষমতা সংকুচিত হয়ে পড়ে এবং সংসদীয় ও দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা হুমকির সম্মুখীন হয়।

৪। সংসদীয় ঐতিহ্যের অভাব: সংসদীয় গণতন্ত্রের ঐতিহ্য বিকশিত না হওয়ায় প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার সদস্যগণ আইনসভার নিকট জবাবদিহি করতে অস্বস্তিবোধ করতেন। আইনসভার সদস্যগণও মন্ত্রীদেরকে প্রশ্ন করতে বিব্রতবোধ করতেন।

৫। বিষয় বণ্টনের ত্রুটি: প্রাদেশিক বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ এবং গভর্নরের কার্যনির্বাহী পরিষদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টনের ক্ষেত্রেও ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল। যেমন, কৃষি ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত হয় মন্ত্রিপরিষদের ওপর। কিন্তু কৃষির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় জলসেচের বিষয়টি অর্পিত হয় গভর্নরের কার্যনির্বাহী পরিষদের উপর। ফলে কৃষিমন্ত্রী জলসেচের সময় এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পেতেন না।

৬। মন্ত্রিসভা ও কার্যনির্বাহী পরিষদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব: প্রাদেশিক মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ ছিলেন নির্বাচিত, কিন্তু গভর্নরের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ ছিলেন মনোনীত। ফলে মন্ত্রিগণ যখন জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত থাকতেন তখন কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ গভর্নরকে সন্তুষ্ট রাখার কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখতেন। ফলে মন্ত্রিপরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের মধ্যে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি ও সংশয় বৃদ্ধি পায়। উভয় সংস্থার মধ্যে সৃষ্ট বিরোধের ফলে প্রাদেশিক প্রশাসনে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়।

দ্বৈতশাসন

৭। গভর্নরের প্রভুত্বব্যঞ্জক ক্ষমতা ও আচরণ: দ্বৈতশাসন ব্যবস্থায় সাফল্যের পথে সর্বাপেক্ষা বড় বাধা ছিল গভর্নরের প্রভুত্বসুলভ ক্ষমতা ও আচরণ। কার্যনির্বাহী পরিষদের উপর গভর্নরের ক্ষমতা ছিল সীমাহীন। হস্তান্তরিত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রেও তিনি মন্ত্রীদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করতে পারতেন। মন্ত্রিগণ গভর্নরের খেয়ালখুশির উপর স্বপদে বহাল থাকতেন।

৮। সরকারি কর্মচারীদের উপর মন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণের অভাব: মন্ত্রিগণ সরকারি কর্মচারীদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না। কেননা সরকারি কর্মচারীদের নিযুক্তি, বেতন, ভাতা, বদলি ও বরখাস্তকরণ প্রভৃতি বিষয় ভারত সচিবের জন্য সংরক্ষিত ছিল। সরকারি কর্মচারিগণ মন্ত্রীদেরকে গ্রাহ্য করতেন না। ফলে মন্ত্রীদের পক্ষে প্রশাসন পরিচালনা করা ও আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৯। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ: দ্বৈতশাসনের ব্যর্থতার জন্য সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষও কম দায়ী ছিল না। হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যকার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট করে।

দ্বৈতশাসন

১০। আর্থিক অসংগতি : মন্ত্রীদের ওপর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব অর্পিত হলেও অর্থ দপ্তর পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল গভর্নর ও তাঁর কার্যনির্বাহী পরিষদের হাতে। মন্ত্রিগণ প্রাত্যহিক কাজে আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হতেন এবং অনেক সময় প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হতেন।

১১। জনগণের বিরোধিতা: স্বায়ত্তশাসন ও দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হওয়ায় এবং কংগ্রেসের আন্দোলনের ফলে জনগণ শীঘ্রই দ্বৈতশাসনের বিরোধিতা শুরু করে। ফলে এ ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে পড়ে। গতি সিনিয়র

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – ব্রিটিশ-ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ ও ভারত বিভাগ

টপিক – ১৬ খিলাফত আন্দোলন

টপিক ১৬: খিলাফত আন্দোলন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

খিলাফত আন্দোলন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক-জার্মান 'অক্ষ শক্তি' গ্রেট ব্রিটেনের নেতৃত্বাধীন 'মিত্রশক্তির' নিকট পরাজিত হয়। বিশ্বযুদ্ধ শেষে গ্রেট ব্রিটেন ও মিত্রশক্তি তুরস্ক সাম্রাজ্যকে খণ্ড-বিখণ্ড করে এর শক্তিকে দুর্বল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তারা তুরস্ককে ১৯২০ সালে সম্পাদিত 'স্যাভার্স চুক্তি' স্বীকার করতে বাধ্য করে। এ চুক্তি ছিল তুরস্কের জন্য অপমানজনক। এর প্রতিবাদে ১৯২০ সালে ভারতীয় মুসলমান জনগণ আন্দোলন শুরু করেন। কেননা ভারতীয় মুসলমান জনগণ তুরস্কের সুলতানকে সমগ্র মুসলিম জাহানের খলিফা ও ঐক্যের প্রতীক বলে মনে করতো। এ আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করেন মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ। এ আন্দোলন 'খিলাফত আন্দোলন' নামে পরিচিত।

খিলাফত আন্দোলন চলাকালীন সময়ে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের 'অহিংস অসহযোগ আন্দোলন' শুরু হয়। গান্ধীজী খিলাফত আন্দোলনের প্রতিও তাঁর সমর্থন জ্ঞাপন করেন। এর ফলে খিলাফত আন্দোলন আরো তীব্র হয়ে ওঠে। গান্ধীজী খিলাফত আন্দোলনেরও অন্যতম প্রধান নেতায় পরিণত হন।

খিলাফত আন্দোলন

১৯২১ সালের ৫ নভেম্বর কংগ্রেস 'আইন অমান্য নিকটবর্তী চৌরিচৌরা নামক স্থানে আন্দোলনরত জনতার উপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। এর ফলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে পুলিশ একটি ঘরের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। ক্ষিপ্ত জনতা ঐ ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে ৫ ফেব্রুয়ারি একজন দারোগাসহ ২২ জন পুলিশের মৃত্যু ঘটে। গান্ধীজী আন্দোলনের এ সহিংসরূপ দেখে মর্মাহত হন এবং আকস্মিকভাবে ১৯২২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি বারদৌলীতে কংগ্রেসের কার্যকরী সভায় আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এ সময় তুরস্কের বিপ্লবী নেতা মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক তুরস্কের ক্ষমতা দখল করেন। ১৯২৩ সালের ১৭ নভেম্বর তিনি তুরস্ককে 'প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা এবং 'খিলাফত' তথা 'তুরস্ক সালতানাতকে' বাতিল ঘোষণা করেন। এর ফলে ১৯২৪ সালে ভারতে খিলাফত আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

খিলাফত আন্দোলন ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ আন্দোলনের ফলে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটে এবং মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার শিক্ষা অর্জন করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – ব্রিটিশ-ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ ও ভারত বিভাগ

টপিক – ১৬ অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-১৯২২)

টপিক ১৬: অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-১৯২২)

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-১৯২২)

ব্রিটিশ সরকার কুখ্যাত 'রাউলাট আইন' পাস করলে ভারতীয় জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল এ আইনের প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত পাঞ্জাবের অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগের শান্তিপূর্ণ সভায় ব্রিটিশ সরকার গুলি চালালে অসংখ্য মানুষ হতাহত হয়। এর প্রতিবাদে কংগ্রেস নেতা মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। গান্ধীজী হিংসাত্মক পথ বর্জন এবং সত্যাগ্রহ নীতিকে সামনে রেখে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এ আন্দোলনের কর্মসূচির মধ্যে ছিল ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত সকল খেতাব ও সম্মানজনক পদবি প্রত্যাহার, বিদেশি পণ্য বয়কট, স্কুল-কলেজ, আদালত ইত্যাদি বর্জন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ আন্দোলনের প্রতি সম্মান জানিয়ে ব্রিটিশ প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি বর্জন করেন। আন্দোলন দুর্বার হয়ে ওঠে।

অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-১৯২২)

১৯২১ সালের ৫ নভেম্বর কংগ্রেস 'আইন অমান্য আন্দোলন' শুরু করলে অহিংস আন্দোলন সহিংস রূপ ধারণ করতে থাকে। ১৯২২ সালে উত্তর প্রদেশের গোরখপুরের নিকটবর্তী চৌরিচৌরা নামক স্থানে আন্দোলনরত জনতার উপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। এর ফলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে পুলিশ একটি ঘরের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। ক্ষিপ্ত জনতা ঐ ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে ১৯২২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি একজন দারোগাসহ ২২ জন কনেস্টবল মৃত্যুবরণ করে। ফলে ১৯২২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি বারদৌলীতে কংগ্রেসের কার্যকরী সভায় গান্ধীজী তাৎক্ষণিকভাবে আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন। তবে আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটলেও তা' জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি করে।

অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-১৯২২)

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ছিলেন অসাম্প্রদায়িক ও উদার মনের রাজনীতিবিদ। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, বাংলার শতকরা ৬০ জন মানুষ মুসলমান। অথচ সরকারি চাকরি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতবাসীকে মুক্ত ও স্বাধীন করতে হলে প্রয়োজন হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। এজন্য তিনি স্যার আব্দুর রহিম, স্যার আব্দুল করিম, মাওলানা আকরাম খান, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মৌলভী মজিবর রহমান প্রমুখ মুসলমান নেতার সাথে আলাপ-আলোচনার পর ১৯২৩ সালে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামে একটি ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদন করেন। এর ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। মুসলমান জনগণের চাকরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা লাভের সুযোগ সৃষ্টি হয়। কিন্তু ১৯২৫ সালের ১৬ জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের আকস্মিক মৃত্যুর ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি সৃষ্টির যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল তা' ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে থাকে। চল্লামবলার এসকে দুই লিগন্যান

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – ব্রিটিশ-ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ ও ভারত বিভাগ

টপিক – ১৮ সাইমন কমিশন

টপিক ১৮: সাইমন কমিশন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সাইমন কমিশন

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে বলা হয়েছিল যে, এই আইন প্রবর্তনের দশ বছর পর ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য একটি বিধিবদ্ধ কমিশন গঠন করা হবে। ভারতবাসীর মনে সৃষ্ট বিক্ষোভ ও হতাশা এবং ক্রমবর্ধমান হিন্দু-মুসলমান বিরোধ লক্ষ্য করে নির্ধারিত সময়ের দুই বছর পূর্বেই ১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে ভারতের বড়লাট লর্ড আরউইন 'Indian Statutory Commission' গঠনের কথা ঘোষণা করেন। লর্ড আরউইন কোনো ভারতীয়কে এই কমিশনের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কেননা তাঁর ধারণা ছিল কমিশনের নিরপেক্ষ চরিত্র বজায় রাখার জন্যই এতে কোনো ভারতীয়কে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয়। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা বড়লাট লর্ড আরউইনের মতকে সমর্থন এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বিভিন্ন দলীয় সদস্যদের নিয়ে কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরপর প্রখ্যাত ব্রিটিশ উদারনৈতিক নেতা ও বিশিষ্ট সাংবিধানিক আইনবিশারদ স্যার জন সাইমন-এর নেতৃত্বে সাত সদস্যবিশিষ্ট কমিশন গঠিত হয়। স্যার জন সাইমন ব্যতীত অন্য সদস্যগণ হলেন ভাইকাউন্ট বার্নহ্যাম, লর্ড স্ট্র্যাথকোনা, এডওয়ার্ড ক্যাডোগান, স্টিফেন ওয়ালশ, মেজর এটলী এবং কর্নেল লেন ফক্স।

সাইমন কমিশন

কমিশনের মূল দায়িত্ব ছিল ব্রিটিশ ভারতের শাসনব্যবস্থার কার্যধারা, শিক্ষার অগ্রগতি, প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাগুলোর উন্নয়ন এবং দায়িত্বশীল সরকারের নীতি স্থাপন বিষয়ে মতামত প্রদান। কমিশনের প্রধান জন সাইমনের নামানুসারে এটি 'সাইমন কমিশন' নামে পরিচিতি অর্জন করে। ১৯২৭ সালের ৮ নভেম্বর এক রাজকীয় ঘোষণার দ্বারা এই কমিশন নিযুক্ত করা হয়। কোনো ভারতীয়কে এই কমিশনে অন্তর্ভুক্ত না করায় ভারতীয় জনগণ একে “All White Commission" বা 'সাদা কমিশন' বলে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ও সমালোচনার ঝড় তোলে।

সাইমন কমিশন

ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ ও সকল সম্প্রদায়ের জনগণ 'সাইমন কমিশন' বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সর্বস্তরের জনগণের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি জাতীয় সংবিধান রচনার দাবি জানায়। সাইমন কমিশনের সদস্যবর্গ ১৯২৮ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত প্রথমবার ভারতে এসে তথ্যানুসন্ধান চালায়। এরপর অক্টোবর মাসে দ্বিতীয়বার ভারতে এসে তাঁরা বিভিন্ন স্থানে জনপ্রতিনিধিদের সাথে মত বিনিময় করেন। বিদ্যমান রাজনৈতিক অসন্তোষ ও অর্থনৈতিক দুর্দশা ইত্যাদি কারণে 'সাইমন কমিশন বর্জন আন্দোলন' স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রাণবন্ত আকার ধারণ করে। ১৯২৮ সালের ৩০ অক্টোবর লাহোরে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে লালা লাজপত রায়ের নেতৃত্বে পরিচালিত প্রতিবাদ মিছিলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। লালা লাজপত রায় গুরুতররূপে আহত হন এবং ১৭ নভেম্বর প্রাণত্যাগ করেন। ৩০ নভেম্বর একটি প্রতিবাদ মিছিলে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং গোবিন্দ বল্লভ পন্থ পুলিশের অত্যাচারে আহত হন। 'সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলন' আরো দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলতে থাকে।

সাইমন কমিশন

১৯৩০ সালের ২৭ মে 'সাইমন কমিশন' দুখণ্ডে তাদের রিপোর্ট প্রকাশ করে। সাইমন কমিশনের সুপারিশগুলো ছিল : ১. সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন, ২. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান, ৩. প্রদেশে দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটানো, ৪. শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠন, ৫. প্রদেশগুলোতে আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব সরকারি সদস্যের হাতে ন্যস্তকরণ, ৬. প্রয়োজনবোধে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত রদ করার ক্ষমতা গভর্নরের হাতে অর্পণ, ৭. প্রাদেশিক আইনসভার পরিধি সম্প্রসারণ, ৮. ভোটাধিকার সম্প্রসারণ, ৯. মনোনীত সদস্যের সংখ্যা প্রাদেশিক আইনসভার মোট সদস্যসংখ্যার ১০% বেশি না করা, ১০. সম্প্রদায়ভিত্তিক পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা বজায় রাখা, ১১. মুসলমান সম্প্রদায়কে সংখ্যানুপাতিক হার অপেক্ষা কিছু বেশি আসন প্রদান, ১২. বার্মার প্রশাসন ভারতের প্রশাসন থেকে পৃথকীকরণ, ১৩. সিন্ধু ও উড়িষ্যা পৃথক প্রদেশ হবে কিনা তা বিশেষজ্ঞ - ব্যক্তি দ্বারা যাচাইকরণ, ১৪. উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আইনসভা গঠন এবং কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে ঐ প্রদেশের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধিকরণ, ১৫. ফেডারেল শাসন পদ্ধতির ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় আইনসভার পুনর্গঠন প্রভৃতি।

সাইমন কমিশন

ব্রিটিশ ভারতের সব দল ও সব সম্প্রদায় 'সাইমন কমিশন রিপোর্ট' প্রত্যাখ্যান করে। তবে ভারতবাসীর ক্ষোভ দূর করা ও আন্দোলনের পথ থেকে তাদেরকে কৌশলে সরিয়ে নেয়ার জন্য একটি 'সর্বদলীয় গোল টেবিল বৈঠক' করার আহ্বান জানায় ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রণয়নের সময় 'সাইমন কমিশনের' সুপারিশসমূহ বাস্তবায়িত হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – ব্রিটিশ-ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ ও ভারত বিভাগ

টপিক – ১৯ নেহরু রিপোর্ট, ১৯২৮

টপিক ১৯: নেহরু রিপোর্ট, ১৯২৮

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

নেহরু রিপোর্ট, ১৯২৮

ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবর্গ 'সাইমন কমিশন রিপোর্ট' প্রত্যাখ্যান করে 'আইন অমান্য আন্দোলন' শুরু করে। এ সময় ভারত সচিব বার্কেনহেড ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতবাসীদেরকে মিলিতভাবে একটি সংবিধান রচনার চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ভারতে পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার উপযোগী সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে একটি সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে পণ্ডিত নেহরুকে সম্পাদক করে একটি কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটি ১৯২৮ সালের আগস্ট মাসে যে রিপোর্ট পেশ করে তা' 'নেহরু রিপোর্ট' নামে পরিচিত।

'নেহরু রিপোর্ট' প্রকাশিত হলে মুসলমান নেতৃবৃন্দ মর্মাহত হন। কেননা তাঁরা মনে করেন যে, নেহরু রিপোর্ট হচ্ছে 'লক্ষ্ণৌ চুক্তি', 'বেঙ্গল প্যাক্ট' প্রভৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী। মুসলমান নেতৃবৃন্দের সংশোধনী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে তাঁরা দিল্লিতে মুসলিম লীগের সম্মেলন আহ্বান করেন।

নেহরু রিপোর্ট, ১৯২৮

'নেহরু রিপোর্ট' মুসলমান নেতৃবৃন্দকে আশাহত করে। ১৯২৯ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁরা দিল্লিতে মুসলিম লীগের সভা আহ্বান করেন। এ সভায় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ তাঁর বিখ্যাত '১৪ দফা' পেশ করেন। জিন্নাহর এ '১৪ দফা' ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অগ্রগতির ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মি. জিন্নাহ্ এ সময় অনুভব করেন যে, অখণ্ড ভারতে মুসলমানদের ভাগ্য কোনো দিনই নিশ্চিত হতে পারে না। এ চিন্তা-চেতনা থেকেই পরবর্তীতে উদ্ভব ঘটে তাঁর বিখ্যাত 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' (Two Nation's Theory) ।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – ব্রিটিশ-ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ ও ভারত বিভাগ

টপিক – ২০ গোলটেবিল বৈঠক, ১৯৩০-১৯৩২

টপিক ২০: গোলটেবিল বৈঠক, ১৯৩০-১৯৩২

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

গোলটেবিল বৈঠক, ১৯৩০-১৯৩২

'নেহরু রিপোর্ট' এবং 'জিন্নাহ্ ১৪ দফা' প্রস্তাবের ফলে ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। এর সমাধানকল্পে ১৯২৯ সালে গভর্নর জেনারেল লর্ড আরউইন লন্ডনে 'গোলটেবিল বৈঠক' অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেন।

গোলটেবিলের প্রথম অধিবেশন চলে ১৯৩০ সালের ১২ নভেম্বর থেকে ১৯৩১ সালের ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত। এই বৈঠক উদ্বোধন করেন ব্রিটিশ সম্রাট পঞ্চম জর্জ এবং এতে সভাপতিত্ব করেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড। এতে মি. জিন্নাহ্, তেজ বাহাদুর সপ্রু, শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, ড. বি. আর আম্বেদকার প্রমুখ নেতা অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু ভারতকে 'ডোমিনিয়ন মর্যাদা' প্রদানের ঘোষণা প্রদান না করায় কংগ্রেস এতে যোগদান করেনি। সংখ্যালঘু সমস্যা নিয়ে মতৈক্য না হওয়ায় প্রথম গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

গোলটেবিল বৈঠক, ১৯৩০-১৯৩২

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩১ সালের ৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এবারে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মহাত্মা গান্ধী, মদনমোহন মালব্য ও সরোজিনী নাইডু প্রমুখ বৈঠকে যোগদান করেন। মহাত্মা গান্ধী কেন্দ্রে দ্বৈত শাসন প্রবর্তনের প্রস্তাবসহ কতিপয় প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। মি. জিন্নাহ্ ও শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়ক কতিপয় প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে গান্ধী-জিন্নাহ্ মধ্যে মতৈক্য না হওয়ায় দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়।

তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক ১৯৩২ সালের ১৭ নভেম্বর থেকে ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। কংগ্রেস এ বৈঠক বর্জন করে। ব্রিটিশ সরকার উপস্থিত ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে খুব বেশি সুযোগ-সুবিধা দিতে অস্বীকার করে। ফলে এবারেও গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – ব্রিটিশ-ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ ও ভারত বিভাগ

টপিক – ২১ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন

টপিক ২১: ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন

ক. পটভূমি: ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 'নেহেরু রিপোর্ট' এবং মি. জিন্নাহ্ 'চৌদ্দ দফা দাবি' প্রকাশিত হলে ভারতবর্ষে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ও সংকট সৃষ্টি হয়। এ অচলাবস্থা দূর করার জন্য ব্রিটিশ সরকার পর পর তিনটি গোলটেবিল বৈঠকের ব্যবস্থা করে ভারতবাসীদের মনোভাব জানার চেষ্টা করেন। গোলটেবিল বৈঠকসমূহের প্রস্তাবাবলি একটি 'শ্বেত পত্রে' (White Paper) প্রকাশ করা হয়। এ 'শ্বেত পত্রটি' ব্রিটিশ পার্লামেন্টের 'যুক্ত কমিটি' দ্বারা পরীক্ষিত ও সংশোধিত হয়ে ১৯৩৪ সালের ২২ নভেম্বর একটি 'রিপোর্ট' আকারে পেশ করা হয়। এ রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই ১৯৩৫ সালের ৪ জুন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ কমন্সসভায় এবং ২৪ জুলাই উচ্চকক্ষ লর্ডসভায় 'ভারত শাসন আইন' পাস হয়। ১৯৩৫ সালের ২ আগস্ট তা রাজকীয় সম্মতি লাভ করে। এটিই '১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন' নামে খ্যাত।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন

খ. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Features of the Govt. of India Act, 1935): ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

১. সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা: এ আইনে ব্রিটিশ-ভারতের ১১টি প্রদেশ ও যোগদানেচ্ছুক দেশীয় রাজ্যগুলো নিয়ে একটি 'সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র' গঠনের প্রস্তাব বা পরিকল্পনা করা হয়।

২. সরকারি বিষয় বিভাগ বা ক্ষমতা বণ্টন নীতি: এ আইনে শাসন সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়; যথা : (ক) কেন্দ্রীয় বিষয়, (খ) প্রাদেশিক বিষয়, (গ) যুগ্ম বিষয়। কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রীয় তালিকায় ৫৯টি বিষয়, যুগ্মতালিকায় ৩৬টি বিষয় এবং প্রাদেশিক তালিকায় ৫৪টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৩. কেন্দ্রে দ্বৈতশাসন: এ আইনে প্রদেশে দ্বৈতশাসন রহিত করা হয়। কিন্তু কেন্দ্রে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। কেন্দ্রীয় বিষয়সমূহকে 'সংরক্ষিত' ও 'হস্তান্তরিত'-এ দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। 'হস্তান্তরিত বিষয়সমূহ' নির্বাচিত মন্ত্রিসভার হাতে ন্যস্ত করা হয়। মন্ত্রিসভা এসব দায়িত্ব পালনে আইনসভার নিকট দায়ী ছিলেন। 'সংরক্ষিত বিষয়সমূহ' পরিচালনার ভার গভর্নর জেনারেল ও তাঁর উপদেষ্টামণ্ডলীর হাতে ন্যস্ত করা হয়। উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্যগণ আইনসভার নিকট দায়ী ছিলেন না।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন

৪. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন: এ আইনে প্রদেশসমূহে দ্বৈতশাসন রহিত করা হয় এবং স্বায়ত্তশাসন ও দায়িত্বশীল সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়। প্রাদেশিক বিষয়সমূহের উপর প্রদেশের কর্তৃত্ব স্বীকার করা হয়। প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাকে আইনসভার নিকট দায়ী বা জবাবদিহি করার বিধান করা হয়।

৫. যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত: : এ আইনে একজন প্রধান বিচারপতি ও অন্য দু'জন বিচারক নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত গঠিত হয়। এ আদালতের হাতে সংবিধানকে ব্যাখ্যার ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। তবে ব্রিটিশ 'প্রিভি কাউন্সিল' সর্বোচ্চ আপিল আদালত হিসেবে থেকে যায়।

৬. গভর্নর জেনারেল ও গভর্নরদের বিশেষ ক্ষমতা: এ আইনে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান গভর্নর জেনারেল ও প্রাদেশিক গভর্নরদেরকে প্রচুর ক্ষমতা প্রদান করা হয়। গভর্নর জেনারেল ও প্রাদেশিক গভর্নরগণ নিয়মতান্ত্রিক প্রধান ছিলেন না। তারা মন্ত্রিসভার উপদেশ উপেক্ষা করতে পারতেন। গভর্নর জেনারেল ও গভর্নরগণের হাতে 'বিশেষ ক্ষমতা', 'স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা' এবং 'ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধিমূলক ক্ষমতা' অর্পণ করা হয়। গভর্নর জেনারেল 'অধ্যাদেশ' জারি করতে পারতেন এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা প্রণীত আইনের বিরুদ্ধে 'ভেটো' প্রয়োগ করতে পারতেন।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন

৭. দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা: এ আইনে কেন্দ্রে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার ব্যবস্থা করা হয়। উচ্চকক্ষের নামকরণ হয় 'রাষ্ট্রীয় সভা' (Council of States) এবং নিম্নকক্ষের নামকরণ হয় 'ব্যবস্থাপক সভা' (Federal Assembly) ।

ক. ব্যবস্থাপক সভা (House of Assembly): ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় বা কেন্দ্রীয় আইনসভার নিম্নকক্ষের নাম ছিল ব্যবস্থাপক সভা বা বিধানসভা। অনধিক ৩৭৫ জন সদস্য নিয়ে এ কক্ষ গঠিত হতো। এ ৩৭৫টি আসনের মধ্যে ১২৫ জন দেশীয় রাজাদের দ্বারা মনোনীত হতেন। বাকি ২৫০টি আসনের মধ্যে ৪টি আসন ছিল অ-প্রাদেশিক আসন। এ ১টি আসনের মধ্যে ৩টি আসন বণিক ও শিল্প সংস্থা কর্তৃক এবং ১টি আসন শ্রম সংস্থার প্রতিনিধিদের দ্বারা পূরণ করা হতো। বাদবাকি ২৪৬ জন প্রতিনিধি প্রাদেশিক আইন পরিষদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হতেন। এ ২৪৬ জন প্রতিনিধির মধ্যে কোন্ সম্প্রদায় থেকে কত জন থাকবেন এরূপ সম্প্রদায়ভিত্তিক আসন বণ্টনেরও বিধান করা হয়েছিল। নিম্নে দুটি ছকের সাহায্যে তা দেখানো হলো :

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন

(ক) প্রদেশভিত্তিক আসন বণ্টনের ছক

প্রদেশ	আসন সংখ্যা
বাংলা	৩৭
মাদ্রাজ	৩৭
যুক্তপ্রদেশ	৩০
বোম্বাই	৩০
পাঞ্জাব	৩০
বিহার	৩০
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৩০
আসাম	০৫
উড়িষ্যা	০৫
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	০৫
সিন্ধু	০৫
দিল্লি	০২
বেলুচিস্তান	০১
আজমীর ও মারওয়ার	০১
কোর্গ	০১
সর্বমোট	২৪৬ জন

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন

(খ) সম্প্রদায়ভিত্তিক আসন বণ্টনের ছক

সম্প্রদায়	আসন সংখ্যা
সাধারণ	৯৭
মুসলিম	৮২
শিল্প-বণিক	১১
শিখ	১০
শ্রমজীবী	১০
মহিলা	০৯
ইউরোপীয়	০৮
ভারতীয় খ্রিস্টান	০৮
জমিদার	০৭
এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান	০৪
সর্বমোট	২৪৬ জন

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন

ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে ১ জন স্পিকার (Speaker) নির্বাচিত হতেন। ব্যবস্থাপক সভার কার্যকালের মেয়াদ ছিল ৫ বছর। তবে গভর্নর জেনারেল নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হবার পূর্বেও ব্যবস্থাপক সভা ভেঙে দিতে পারতেন। ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য হতে হলে কমপক্ষে ২৫ বছর বয়স্ক হতে হতো। ব্রিটিশ রাজশক্তির অধীন কোনো বেতনভুক্ত কর্মচারী, অপ্রকৃতিস্থ, দেউলিয়া ও দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য পদপ্রার্থী হতে পারতেন না।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন

খ. রাষ্ট্রীয় সভা (Council of State): কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার উচ্চকক্ষের দ্বিতীয় কক্ষের নাম ছিল- 'রাষ্ট্রীয় সভা'। রাষ্ট্রীয় সভার সদস্যসংখ্যা ছিল অনধিক ২৬০ জন। এর মধ্যে ১৫৬ জন ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলোর প্রতিনিধি এবং ১০৪ জন ছিলেন দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি। ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলোর ১৫৬ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১৪০ জন সদস্য পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হতেন। অবশিষ্ট ১০ জন সদস্যের মধ্যে (অ-প্রাদেশিক ভিত্তিতে) ৭ জন ছিলেন ইউরোপীয় সদস্য, ২ জন ভারতীয় খ্রিস্টান এবং ১ জন এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য হতে হলে কমপক্ষে ৩০ বছর বয়স্ক হতে হতো। ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডিত, দেউলিয়া, মানসিকভাবে অপ্রকৃতিস্থ ও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্যপদ প্রার্থী হতে পারতেন না। রাষ্ট্রীয় পরিষদের কার্যকাল ছিল ৯ বছর। তবে প্রতি ৩ বছর পর পর এক-তৃতীয়াংশ সদস্যকে বিদায় নিতে হতো। পরিষদের কাজ পরিচালনার জন্য নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে সভাপতি নির্বাচিত করা হতো।

আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষের সদস্য নির্বাচনে মাত্র ১ লক্ষ ভারতীয়কে ভোটাধিকার প্রদান করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে ভোটাধিকারের ভিত্তি ছিল সম্পত্তিগত যোগ্যতা।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন

(ক) প্রদেশভিত্তিক আইনসভার আসন বণ্টন

প্রদেশ	আসন সংখ্যা
বাংলা	২০
যুক্তপ্রদেশ	২০
মাদ্রাজ	২০
পাঞ্জাব	১৬
বোম্বাই	১৬
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	০৮
আসাম	০৬
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	০৫
সিন্ধু	০৫
উড়িষ্যা	০৫
দিল্লি	০১
বেলুচিস্তান	০১
আজমীর ও মারওয়ার	০১
কোর্গ	০১
অ-প্রাদেশিক	১০
সর্বমোট	১৩৫ জন

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন

(খ) সম্প্রদায়ভিত্তিক আসন বণ্টন

সম্প্রদায়	আসন সংখ্যা
সাধারণ	৭৫
মুসলিম	৪৯
ইউরোপীয়	০৭
মহিলা	০৬
হরিজন	০৬
শিখ	০৪
ভারতীয় খ্রিস্টান	০২
এ্যাংলো ইন্ডিয়ান	০১
সর্বমোট	১৫০ জন

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন

৮. নতুন প্রদেশ গঠন :এ আইন দ্বারা সিন্ধু ও উড়িষ্যা নামে দুটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়।

৯. বার্মার পৃথকীকরণ :এ আইন দ্বারা বার্মাকে (মায়ানমার) ভারতবর্ষ থেকে পৃথক করা হয়।

১০. প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার বিন্যাস : এ আইন দ্বারা পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু রাখা হয় এবং কেন্দ্রীয় আইনসভার এক-তৃতীয়াংশ আসন মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। এ আইনে সাধারণ আসনগুলোতে তফসিলভুক্ত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের জন্য কিছু সংখ্যক আসন সংরক্ষিত রাখা হয়।

১১. শাসন বিভাগের প্রাধান্য: গভর্নর জেনারেল ও গভর্নরদেরকে কতগুলো বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করায় আইনসভার উপর শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। গভর্নর জেনারেল আইনসভা প্রণীত আইনে 'ভেটো' প্রয়োগ করতে পারতেন।

১২. সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা : এ আইনে সংবিধান সংশোধন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের ক্ষমতা ভারতের কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক আইনসভার পরিবর্তে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উপর ন্যস্ত করা হয়।

১৩. স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন: এ আইনে প্রথমবারের মতো নির্বাচনের মাধ্যমে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – ব্রিটিশ-ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ ও ভারত বিভাগ

টপিক – ২২ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের গভর্নর জেনারেল

টপিক ২২: ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের গভর্নর জেনারেল

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের গভর্নর জেনারেল

ভূমিকা : ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে গভর্নর জেনারেল, তার উপদেষ্টা ও মন্ত্রিমণ্ডলীর সমন্বয়ে শাসন বিভাগ গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় ও যুগ্ম তালিকাভুক্ত সকল বিষয়ের উপর তার কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত ছিল। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ও ভারত সচিবের সুপারিশক্রমে ব্রিটিশ রাজ কর্তৃক পাঁচ বছরের জন্য তিনি স্বপদে নিযুক্ত হতেন। ব্রিটিশ রাজের নিকট থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনামা অনুসারে গভর্নর জেনারেল তাঁর দায়িত্ব পালন করতেন।

পদমর্যাদা : ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে গভর্নর জেনারেলই ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের মূল স্তম্ভ। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্বাহী ক্ষমতা ব্রিটিশ সম্রাটের পক্ষ থেকে গভর্নর জেনারেল কর্তৃক পরিচালিত হতো। তিনি ছিলেন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রকৃত শাসক প্রধান। ভারতের শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে তাঁর দক্ষতা ও ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভরশীল ছিল। তিনি যে কোনো ভারতীয় আদালতের বিচারের ঊর্ধ্বে ছিলেন।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের গভর্নর জেনারেল

গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা ও কার্যাবলি: ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা ও কার্যাবলি ছিল নিম্নরূপ:

ক. স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা: যে সব বিষয়ে গভর্নর জেনারেল মন্ত্রীদের সাথে পরামর্শ না করে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন সেগুলো ছিল তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার আওতাভুক্ত। প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, ধর্ম ও উপজাতীয় এলাকা সংক্রান্ত বিষয় তাঁর হাতে সংরক্ষিত ছিল। এ সব বিষয়ে তিনি স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। এ সব সংরক্ষিত বিষয় পরিচালনায় তিনি তিনজন উপদেষ্টার সহায়তা নিতেন। উপদেষ্টাগণ তাঁর কাছে দায়ী ছিলেন এবং তাঁর দ্বারা নিয়োগ প্রাপ্ত হতেন। স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাবলে তিনি উপদেষ্টাবৃন্দ, এ্যাডভোকেট জেনারেল, অডিটর জেনারেল, হাইকোর্টের বিচারপতি, রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর, হাইকমিশনার, ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবর্গ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়োগ করতেন।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের গভর্নর জেনারেল

খ. ব্যক্তিগত বিবেচনাধীন ক্ষমতা ও বিশেষ দায়িত্ব: যে সব বিষয়ে গভর্নর জেনারেল মন্ত্রিসভার সাথে পরামর্শ করলেও সে পরামর্শ বা উপদেশ অগ্রাহ্য করে স্বীয় বিচারবুদ্ধি অনুসারে কাজ করতে পারতেন, সেগুলো ছিল তাঁর ব্যক্তিগত বিবেচনাধীন ক্ষমতার আওতাভুক্ত। যে সব বিষয়ে গভর্নর জেনারেল স্বীয় বিবেচনাধীন ক্ষমতা কার্যকর করতেন এবং বিশেষ দায়িত্ব ভোগ করতেন সেগুলো ছিল নিম্নরূপ:

১। ভারতবর্ষ বা এর যে কোনো অংশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের যে কোনো হুমকিকে দমন করা।

২। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও মর্যাদা রক্ষা করা।

৩। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার সংরক্ষণ করা।

৪। সরকারি কর্মচারীদের ন্যায্য অধিকার ও স্বার্থরক্ষা করা।

৫। ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলোর স্বার্থ সংরক্ষণ এবং দেশীয় রাজ্যের শাসকদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করা।

৬। ব্রিটেন ও বার্মা হতে আমদানিকৃত দ্রব্যের উপর কোনো বৈষম্যমূলক কর আরোপ বন্ধ করা।

৭। ব্রিটিশ নাগরিকদের বাণিজ্যিক বৈষম্য দূর করা।

৮। বিভেদমূলক আইনকে প্রতিহত করা।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের গভর্নর জেনারেল

গ. মন্ত্রিসভার পরামর্শক্রমে ব্যবহৃত ক্ষমতা: গভর্নর জেনারেল যে সব বিষয়ে মন্ত্রিসভার সাথে পরামর্শ করে ব্যবস্থা নিতেন সেগুলো ছিল এ ধরনের ক্ষমতার আওতাভুক্ত। হস্তান্তরিত বিষয় পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি মন্ত্রিসভার পরামর্শ নিতেন। তিনি তার মন্ত্রীদের নিয়োগ ও বরখাস্ত করতে পারতেন। কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্যদের আস্থা অর্জনে সক্ষম ব্যক্তিদের মধ্য থেকে তিনি অনধিক দশজন মন্ত্রী নিয়োগ করতেন এবং তাদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করতেন।

ঘ. আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা: আইন প্রণয়ন ক্ষেত্রেও গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা ও প্রভাব ছিল অনন্য সাধারণ। স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বলে তিনি আইন সভার যে কোনো অধিবেশন আহ্বান বা স্থগিত রাখতে পারতেন। তিনি আইনসভার নিম্নকক্ষও ভেঙে দিতে পারতেন। তিনি আইনসভায় বক্তৃতা প্রদান কিংবা বাণী প্রেরণ করতেন। আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত কোনো বিলে সম্মতি প্রদান, স্থগিত কিংবা পুনর্বিবেচনার জন্য পুনরায় আইনসভায় ফেরত পাঠাতে পারতেন কিংবা রাজকীয় অনুমোদনের জন্য সংরক্ষিত রাখতে পারতেন।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের গভর্নর জেনারেল

স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাবলে তিনি জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য 'অধ্যাদেশ' জারি করতে পারতেন। এ সকল 'অধ্যাদেশ' বা জরুরি আইন ছয় মাস বলবৎ থাকত। তবে গভর্নর জেনারেল প্রয়োজনে এক মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়িয়ে দিতে পারতেন। গভর্নর জেনারেল তার বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য 'গভর্নর জেনারেলের আইন' নামে একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করতে পারতেন। গভর্নর জেনারেল ভারতবর্ষের কোনো অংশের শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষার অজুহাতে তার ইচ্ছাধীন ক্ষমতাবলে যে কোনো বিল বা বিলের কোনো ধারা বা সংশোধনী আলোচনা বন্ধ করে দিতে পারতেন। গভর্নর জেনারেল বা প্রাদেশিক গভর্নর কর্তৃক প্রণীত কোনো 'অধ্যাদেশ', পুলিশ বাহিনী সংক্রান্ত কোনো বিল কিংবা ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত সংক্রান্ত কোনো আইনের আলোচনা বা সংশোধনী প্রস্তাব গভর্নর জেনারেলের পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত কেন্দ্রীয় আইনসভায় উত্থাপন করা যেত না। সংবিধানে অনুল্লিখিত কোনো বিষয়ে আইন তৈরির ক্ষমতা তিনি কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক আইনসভাকে অর্পণ করতে পারতেন।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের গভর্নর জেনারেল

ঙ. অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা : ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী গভর্নর জেনারেল প্রভূত পরিমাণে অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা ভোগ করতেন। তিনি আইন সভায় বার্ষিক আর্থিক বিবরণী বা বাজেট পেশ করতেন। বাজেটের ভোটযোগ্য বিষয়সমূহ 'বরাদ্দ দাবি' হিসাবে তাঁর অনুমোদনক্রমে কেন্দ্রীয় আইনসভায় পেশ করা হতো। আইনসভা এসব 'বরাদ্দ দাবি' বা 'মঞ্জুরি দাবি' অগ্রাহ্য করলে গভর্নর জেনারেল 'বিশেষ দায়িত্ব' পালনের নামে আইনসভা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত দাবি পুনরুদ্ধার করতে পারতেন।

চ. প্রদেশের উপর নিয়ন্ত্রণ: ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী গভর্নর জেনারেল প্রদেশসমূহের উপর তাঁর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ চর্চা করতেন। শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার নামে তিনি প্রাদেশিক সরকারের উপর যে কোনো আদেশ জারি করতে পারতেন। জরুরি অবস্থাকালে প্রাদেশিক বিষয়ের উপর তিনি আইন প্রণয়ন করতে পারতেন।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী গভর্নর জেনারেল ছিলেন অবাধ বা একনায়কসুলভ ক্ষমতার অধিকারী এক মহা পরাক্রমশালী শাসক প্রধান। তিনি লন্ডনস্থ ভারত সচিব ছাড়া ভারতবর্ষের কোনো প্রতিষ্ঠানের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য ছিলেন না।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – ব্রিটিশ-ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ ও ভারত বিভাগ

টপিক – ২৩ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন

টপিক ২৩: ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন (Provincial Autonomy) : প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অর্থ সংবিধান সম্মত উপায়ে প্রদেশে স্বশাসন প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ সংবিধানের আওতায় কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে প্রাদেশিক সরকার পরিচালনা করার ক্ষমতাকেই 'প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন' বলে। প্রদেশের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়গুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে যখন প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকে এবং প্রদেশগুলোতে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এক্ষেত্রে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠিত হয় প্রাদেশিক আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে এবং শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার জন্য মন্ত্রিপরিষদকে আইনসভার আস্থাভাজন থাকতে হয়। অনেকে প্রদেশগুলোর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতার উপরও গুরুত্বারোপ করে থাকেন। সুতরাং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন হচ্ছে সংবিধানের আওতায় কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণমুক্ত প্রাদেশিক জনগণের নিজেদের শাসনব্যবস্থা।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রবর্তিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কার্যকারিতা (Working of Provincial Autonomy under the Government of India Act, 1935): যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন একান্ত অপরিহার্য। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন ও দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। এজন্য ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে প্রদেশে যে 'দ্বৈতশাসন' প্রবর্তন করা হয়েছিল তা বাতিল করে দেওয়া হয়। গভর্নর ও মন্ত্রিসভা নিয়ে প্রাদেশিক শাসন বিভাগ গঠিত হয়। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের 'সংসদীয় নেতাকে' (Parliamentary Leader) মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করার বিধান করা হয়। প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার সদস্যগণ ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে আইনসভার আস্থা হারালে পদত্যাগ করতো। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে তত্ত্বগত ও নীতিগতভাবে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হলেও নিম্নলিখিত কারণে তা যথার্থ ছিল না:

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন

১. গভর্নরদের অনিয়মতান্ত্রিক শাসন: ভারতীয় প্রদেশগুলোর গভর্নরগণ নিয়মতান্ত্রিক শাসক ছিলেন না। প্রাদেশিক গভর্নরগণ ছিলেন গভর্নর জেনারেল তথা ব্রিটিশ সরকারের এজেন্ট এবং প্রকৃত শাসক। তাঁদের ক্ষমতা ছিল সীমাহীন। প্রাদেশিক গভর্নরগণ যেকোনো সময় প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার পরামর্শ অগ্রাহ্য করে শাসন পরিচালনা করতে পারতেন।

২. গভর্নরদের জবাবদিহিতার অভাব: প্রাদেশিক গভর্নরগণ ব্রিটিশ রাজা বা রানি কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। প্রাদেশিক আইনসভার নিকট গভর্নরগণ দায়ী ছিলেন না। গভর্নরগণ দায়ী থাকতেন গভর্নর জেনারেল ও ব্রিটিশ সরকারের নিকট।

৩. বিশেষ দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত ক্ষমতা: প্রাদেশিক গভর্নরগণ তাঁদের 'বিশেষ দায়িত্ব' পালনের সময় মন্ত্রিসভার সাহায্য ছাড়াই যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন। এ বিষয়ে আইনসভার সম্মতি প্রয়োজন হতো না।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন

৪. প্রাদেশিক শাসনে হস্তক্ষেপ: প্রাদেশিক গভর্নরগণ তাঁদের 'স্বেচ্ছাধীন' ও 'স্ববিবেচনাপ্রসূত' ক্ষমতা প্রয়োগের সময় গভর্নর জেনারেল ও ভারত সচিবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতেন। গভর্নরের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার প্রাদেশিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পেতেন। প্রাদেশিক আইনসভার এক্ষেত্রে করার কিছুই ছিল না।

৫. গভর্নর জেনারেলের এজেন্ট: প্রাদেশিক গভর্নরগণ কিছু কিছু বিষয়ে আইন তৈরির ক্ষেত্রে গভর্নর জেনারেলের 'এজেন্ট' হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। তাছাড়া 'বিশেষ ক্ষেত্রে' আইন প্রণয়ন করতে গভর্নর জেনারেলের পূর্ব সম্মতি নেওয়ার প্রয়োজন হতো।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন

৬. জরুরি অবস্থা ঘোষণা: গভর্নর জেনারেল জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতেন। জরুরি অবস্থার সময় কেন্দ্র প্রাদেশিক বিষয়েও আইন প্রণয়ন করতে পারত।

৭. সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন প্রাদেশিক আইনসভা: ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক আইনসভাগুলোর ক্ষমতা ছিল নানাদিক থেকে সীমাবদ্ধ। গভর্নরগণ প্রাদেশিক আইনসভা আহ্বান, স্থগিত বা ভেঙে দিতে পারতেন।

৮. ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ: গভর্নর প্রাদেশিক আইনসভার গৃহীত বিলে 'ভেটো' প্রয়োগ করতে পারতেন, অথবা বিলটি তিনি গভর্নর জেনারেলের বিবেচনার জন্য সংরক্ষিত রাখতে পারতেন।

৯. রাজা বা রানির হস্তক্ষেপ: প্রাদেশিক আইনসভায় গৃহীত এবং গভর্নরের সম্মতিপ্রাপ্ত বিল ব্রিটিশ রাজা বা রানি নাকচ করে দিতে পারতেন।

১০. গভর্নরের আইন ও অধ্যাদেশ জারির ক্ষমতা: গভর্নরগণ প্রাদেশিক আইনসভার ইচ্ছার বিরুদ্ধে 'গভর্নরের আইন' (Governor's Act) ও 'অধ্যাদেশ' (Ordinance) জারি করতে পারতেন। ফলে আইনসভার ক্ষমতা ও মর্যাদা হ্রাস পেত।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন

১১. আর্থিক ক্ষেত্রে গভর্নরের অপ্রতিহত ক্ষমতা: প্রাদেশিক সরকারের আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে গভর্নরগণ আইনসভার উপর প্রাধান্য সৃষ্টি করতে পারতেন। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী প্রাদেশিক আইনসভা কর্তৃক বাতিলকৃত কোনো ব্যয়-বরাদ্দ গভর্নর পুনর্বহাল করতে পারতেন।

১২. আইন-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে: আইন-শৃঙ্খলা ও সংখ্যালঘুদের অধিকারের বিষয়ে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ছিল পুরোপুরি অর্থহীন। কেননা, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে আই. সি. এস, আই. পি. এস. ইত্যাদি ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ সরাসরি ভারত সচিব কর্তৃক নিযুক্ত এবং নিয়ন্ত্রিত হতেন। ফলে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত, আদেশ-নির্দেশ এসব কর্মকর্তাগণ নির্ভয়ে অগ্রাহ্য করতেন।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন

১৩. নির্দেশনামা: ব্রিটিশ সরকার 'নির্দেশনামা' জারির মাধ্যমে প্রাদেশিক বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারতেন।

১৪. প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়া: প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার সাথে গভর্নরের মতবিরোধ সৃষ্টি হলে অনেক সময় গভর্নর মন্ত্রিসভা ভেঙে দিতেন।

উপসংহার: সুতরাং ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনে যে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হয়েছিল তা ছিল নামমাত্র ও অর্থহীন। এ আইনে গভর্নর জেনারেল ও প্রাদেশিক গভর্নরকে সীমাহীন ক্ষমতা প্রদান করায় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অর্থহীন হয়ে পড়ে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – ব্রিটিশ-ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ ও ভারত বিভাগ

টপিক – ২৪ ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন

টপিক ২৪: ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিধান করা হলে ভারতীয় জনগণ তথা রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার হয়। ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ১১টি প্রদেশে সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য তাদের মধ্যে বিপুল সাড়া পড়ে যায়। এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে। এ নির্বাচনে ভোটারের সংখ্যা ছিল প্রায় তেত্রিশ কোটি পঞ্চাশ লাখের কাছাকাছি।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ বিলাতে আইন-ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে ১৯৩৬ সালে ভারতে ফিরে আসেন এবং মৃতপ্রায় মুসলিম লীগকে পুনরুজ্জীবিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ও হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীর প্রচেষ্টায় মুসলিম লীগ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি নির্ভরযোগ্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। সোহ্রাওয়ার্দীকে সেক্রেটারি করে অবিভক্ত বাংলার 'মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ড' গঠিত হয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অর্জন করাকে মুসলিম লীগের নির্বাচনি কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন

এ নির্বাচনে কংগ্রেস ভারতের এগারটি প্রদেশের মধ্যে সাতটি প্রদেশে বিরাট সাফল্য লাভ করে। এ প্রদেশগুলো হচ্ছে মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, বোম্বাই ও মুসলমান জনসংখ্যা অধ্যুষিত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। মুসলিম লীগ সংরক্ষিত মুসলিম আসনে সফলতা লাভ করতে ব্যর্থ হয়। অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম লীগ ও শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক-প্রজা পার্টির মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এবং উভয় দলই প্রায় সমান সংখ্যক আসন লাভ করে। অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগের সাফল্যের কৃতিত্ব ছিল হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীর অসাধারণ সাংগঠনিক প্রতিভা। পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশগুলোর মতো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশেও মুসলিম লীগ এরূপ সাফল্য লাভ করতে পারেনি। ভারতের ১১টি প্রদেশে ৪৯১টি মুসলিম আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ মাত্র ১০৩টি আসন লাভ করে। অপরদিকে ৮০৮টি হিন্দু আসনের মধ্যে কংগ্রেস লাভ করে ৭০৬টি আসন। এ নির্বাচনের ফলাফল ভারতীয় মুসলমান নেতাদেরকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তোলে।

১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন

১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের গুরুত্ব

১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের গুরুত্ব নিম্নরূপ :

১. প্রতিনিধিত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন: ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে এ নির্বাচন ছিল ভারতবর্ষে প্রথম নির্বাচন। এ নির্বাচনের মাধ্যমে ভারত উপমহাদেশে প্রতিনিধিত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

২. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন: ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রদেশগুলোতে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের কথা বলা হয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিধানকে বাস্তবরূপ দেওয়ার জন্যই ১৯৩৭ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা হয়। ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কার্যকর করা হয়।

৩. প্রদেশে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন: ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে দায়িত্বশীল শাসন প্রবর্তনের কথা বলা হয়েছিল। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে দায়িত্বশীল শাসন বাস্তবরূপ লাভ ক..।। কেননা এ নির্বাচনে জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের নিকট মন্ত্রিসভার সদস্যগণকে তাঁদের কাজকর্মের জন্য দায়ী করার বিধান বা রীতি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর ফলে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে প্রদেশগুলোতে দায়িত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠার শুভ সূচনা হয়।

১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন

১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের গুরুত্ব

৪. নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন: ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে নির্বাচন ব্যবস্থার ভিত্তি রচিত হয়।

৫. সর্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার প্রয়োগ: ১৯৩৭ সালের এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বপ্রথম 'সর্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার নীতি' কার্যকর হয়। এর ফলে ভবিষ্যতে সুষ্ঠু নির্বাচনের পথ প্রশস্ত।

৬. গণতন্ত্রের ভিত্তি রচনা: ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক আইনসভার এ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের ভিত্তি রচিত হয়। কেননা সর্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বপ্রথম প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ জনগণ লাভ করে।

৭. সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার: ১৯৩৭ সালের এ নির্বাচনের পর পাঞ্জাব ও বাংলা ব্যতীত ভারতের অন্যান্য প্রদেশে কংগ্রেস সরকার গঠন করে। কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলোতে কংগ্রেসী পতাকা উত্তোলন এবং 'বন্দে মাতরম' সংগীত গাওয়া বাধ্যতামূলক ঘোষণা করায় সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার ঘটে। এসব প্রদেশে মুসলমানদের সাথে বিমাতাসুলভ আচরণ করা হয়। এর ফলে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়।

১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন

১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের গুরুত্ব

৮. মুসলমানদের মধ্যে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার উন্মেষ: এ নির্বাচনের পর কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলোতে মুসলমান জনগণের প্রতি বিরূপ আচরণ তাদেরকে ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সজাগ করে তোলে। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ এরপর তাঁর 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' (two nation theory) উপস্থাপন করেন।

৯. শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক-এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি: এ নির্বাচনের পর অবিভক্ত ব্রিটিশ বাংলায় শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক এবং তাঁর সংগঠন 'কৃষক প্রজা পার্টির' জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। রাজনীতিতে শেরে বাংলার আবির্ভাব হবার আগে অবাঙালি মুসলিম লীগ জমিদার, নবাব জমিদার ও ভূস্বামীদের দ্বারাই বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হতো। কিন্তু ১৯৩৭সালের নির্বাচনের পর ভোটাধিকার সম্প্রসারণের ফলে বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – ব্রিটিশ-ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ ও ভারত বিভাগ

টপিক – ২৫ হক মন্ত্রিসভা (১৯৩৭-১৯৪১)

টপিক ২৫: হক মন্ত্রিসভা (১৯৩৭-১৯৪১)

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

হক মন্ত্রিসভা (১৯৩৭-১৯৪১)

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং কৃষক-প্রজা পার্টি-এ তিন দলের কোনো দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয়। সংবিধান অনুযায়ী গভর্নর বঙ্গীয় আইনসভার কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতা শরৎ বসুকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানান। কংগ্রেস হাইকমান্ডের চাপে শরৎবসু 'কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা' গঠনে অনীহা প্রকাশ করলে কৃষক-প্রজা পার্টি নেতা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক আবারো কংগ্রেসের সাথে 'কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা' গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বঙ্গীয় কংগ্রেস নেতাদের অধিকাংশ এ উদ্যোগকে সমর্থন করেন। কিন্তু সর্বভারতীয় ও অবাঙালি কংগ্রেস নেতাগণ শেরে বাংলার জাতীয়তাবাদী ও উদার মানসিকতাকে পছন্দ করলেও তাঁর জমিদারি প্রথা অবসানের দাবিকে মেনে নিতে পারেননি। কেননা মুসলিম লীগের মতোই কংগ্রেসও জমিদারি প্রথা বিলুপ্তকরণের বিরোধী ছিল। এরই সুযোগ গ্রহণ করে মুসলিম লীগ। মুসলিম লীগ শেরে বাংলার নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব করে। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ও তাঁর কৃষক-প্রজা পার্টি এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

হক মন্ত্রিসভা (১৯৩৭-১৯৪১)

এর ফলে রাজনৈতিক দিক থেকে মুসলিম লীগ সুসংগঠিত হবার এবং বাংলার রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পায়। এরপর শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক মুসলিম লীগ, অ-কংগ্রেসী হিন্দু সদস্য এবং অনুন্নত তপশীলী হিন্দু সদস্যদের সমর্থনে একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের এ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় ১১ জন সদস্যের মধ্যে ৬ জন ছিলেন মুসলমান এবং ৫ জন ছিলেন অ-কংগ্রেসী হিন্দু। কৃষক-প্রজা পার্টির পক্ষ থেকে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, সৈয়দ নওশের আলী; মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে খাজা হাবিব উল্লাহ, খাজা নাজিমউদ্দিন ও হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী; বর্ণহিন্দুদের মধ্য থেকে নলিনী রঞ্জন সরকার, বিজয় প্রসাদ সিংহ রায়, কাশিম বাজারের মহারাজা শ্রীশ চন্দ্র নন্দী; তপশীলী হিন্দুদের মধ্য থেকে মুকুন্দ বিহারী মল্লিক, প্রসন্ন রায়কতকে নিয়ে এ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ফজলুল হক মন্ত্রিসভা বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের জন্য ১৯৩৮ সালে 'ক্লাউড কমিশন' গঠন করে। একই সালে 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের' সংশোধন করে জমিদারদের ক্ষমতা হ্রাস এবং কৃষক প্রজাদের অধিকার সম্প্রসারণের চেষ্টা করে। ১৯৩৮ সালে 'বঙ্গীয় চাষী খাতক আইন' পাস করা হয়।

হক মন্ত্রিসভা (১৯৩৭-১৯৪১)

এর ফলে ঋণগ্রস্ত কৃষকগণ ঋণভার লাঘবের সুযোগ পান। এ আইনের আলোকে অবিভক্ত বাংলার সর্বত্র 'ঋণ সালিসি বোর্ড' গঠিত হয় এবং তা কৃষকের ঋণভার লাঘবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ১৯৩৯ সালে 'বঙ্গীয় চাকরি নিয়োগ বিধি' প্রণীত হয়। এতে মুসলমানদের জন্য শতকরা ৫০ ভাগ চাকরি নির্দিষ্ট রাখার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৪০ সালে ফজলুল হক মন্ত্রিসভা 'বঙ্গীয় মহাজনি আইন' প্রণয়ন করে। এ আইন সুদের হার নির্দিষ্ট করে এবং মহাজনদের বাধ্যতামূলক লাইসেন্স গ্রহণের ব্যবস্থা করে। এ আইনও কৃষক মুক্তির জন্য সহায়ক হয়। নবাব সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক ইংরেজ বন্দী নির্যাতনের মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে কলকাতায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যে 'হলওয়েল মনুমেন্ট' নির্মাণ করেছিল ফজলুল হক মন্ত্রিসভা তা অপসারণ করে দেশবাসীর অকুণ্ঠ ভালোবাসা লাভ করতে সক্ষম হয়।

হক মন্ত্রিসভা (১৯৩৭-১৯৪১)

ফজলুল হক মন্ত্রিসভা ছিল দুর্বল। কেননা বিভিন্ন দলের লোক দ্বারা গঠিত এ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা পদে পদে বাধাগ্রস্ত হয়। মুসলিম লীগ এ সময় শেরে বাংলা ফজলুল হকের উপর নানাবিধ চাপ প্রয়োগ করে। মুসলিম লীগের চাপের মুখে তিনি শামসউদ্দিন আহমদকে বাদ দিয়ে জমিদার মোশাররফ হোসেনকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করলে তাঁর নিজ দলেই ভাঙনের সৃষ্টি হয়। ১৯৩৮ সালের পর থেকে কংগ্রেস ও কৃষক-প্রজা পার্টির একাংশ ফজলুল হক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা আনতে শুরু করে। মন্ত্রিসভার স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্যই শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক মুসলিম লীগের মতো সাম্প্রদায়িক দলে ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে যোগদান করতে বাধ্য হন। তিনি প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি এবং হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গঠিত জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদের সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করার জন্য জিন্নাহর আহ্বান শেরে বাংলা প্রত্যাখ্যান করলে উভয়ের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক মুসলিম লীগ ত্যাগ করে 'প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন দল' গঠন করেন। ১৯৪১ সালের ১ ডিসেম্বর মন্ত্রিসভা থেকে মুসলিম লীগ সদস্যদের পদত্যাগ করার ফলে ফজলুল হক মন্ত্রিসভাও পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

হক মন্ত্রিসভা (১৯৩৭-১৯৪১)

১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনের পর থেকে যেসব প্রদেশে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল সেসব প্রদেশের মন্ত্রিসভায় মুসলমান সদস্য অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি নিয়ে তিক্ততার সৃষ্টি হয়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে সম্পর্কের মারাত্মক অবনতি ঘটে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সৃষ্টি হয়। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধনীতি ঘোষণা করে এবং ভারতবাসীদের সহযোগিতা কামনা করা হয়। ব্রিটিশ সরকার 'জাতীয় প্রতিরক্ষা কাউন্সিল গঠন' করে এতে যোগদান করার জন্য প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলোকে আহ্বান জানায়। কংগ্রেস ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে ব্রিটিশ যুদ্ধনীতির প্রতিবাদে সকল প্রদেশের ক্ষমতা থেকে একযোগে পদত্যাগ করে। মুসলিম লীগের ডাকে মুসলমান জনগণ এজন্য উল্লাস প্রকাশ করে। মুসলিম লীগ ২২ ডিসেম্বর 'নাজাত দিবস' (মুক্তি দিবস) উদ্যাপনের ডাক দেয়। ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক আরো তিক্ত হয়ে ওঠে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – ব্রিটিশ-ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ ও ভারত বিভাগ

টপিক – ২৬ জিন্নাহর ‘দ্বিজাতি তত্ত্ব’

টপিক ২৬: জিন্নাহর 'দ্বিজাতি তত্ত্ব'

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

জিন্নাহর ‘দ্বিজাতি তত্ত্ব’

১৯২৮ সালে 'নেহেরু রিপোর্ট' প্রকাশিত হবার পর থেকে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ততর হতে থাকে। ১৯৩৭সালের সাধারণ নির্বাচনের পর প্রদেশগুলোর মন্ত্রিসভায় মুসলমান প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হলে ভারতীয় মুসলমান জনগণ তাদের ভাগ্য সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়ে। এ সময়ে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে মি. জিন্নাহ্ অনুভব করেন যে, অখণ্ড ভারতে মুসলমানদের ভাগ্য কোনো দিনই নিশ্চিত হবে না। এর ফলে তিনি তাঁর 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' উদ্ভাবন করেন।

মি. জিন্নাহ্ ঘোষণা করেন যে, “ইসলাম ও হিন্দুবাদের প্রকৃত স্বরূপ আমাদের হিন্দু বন্ধুরা কেন বুঝতে পারেন না, আমি তা বুঝি না। ইসলাম ও হিন্দুবাদ শুধু ধর্মই নয়, প্রকৃতপক্ষে দুটি ভিন্ন ও সুনির্দিষ্ট সামাজিক ব্যবস্থাও বটে। মুসলমান ও হিন্দু জনগণ কখনো এক জাতি হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে, এটা আশা করা নিছক স্বপ্নতুল্য। একটি অভিন্ন ভারতের ভ্রান্ত ধারণা তার সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এ ভ্রান্ত ধারণাই আমাদের অধিকাংশ দুর্ভাগ্যের কারণ এবং সময়মত এ ধারণা সংশোধন করতে না পারলে তা ভারতকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিবে।

জিন্নাহর 'দ্বিজাতি তত্ত্ব'

হিন্দু ও মুসলিম জনগণ দুটি পৃথক ধর্মীয় দর্শন, সামাজিক আচার-আচরণ এবং সাহিত্যের অধিকারী। তাদের সভ্যতা আলাদা এবং পরস্পর বিরোধী ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-ভাবনাকে আশ্রয় করে সে সভ্যতা গড়ে উঠেছে। জীবনের প্রতি এবং জীবন সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। হিন্দু ও মুসলিম জনগণ অনুপ্রেরণা লাভ করে ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে। তাদের মহাকাব্য ভিন্ন, পূজনীয় বীর আলাদা এবং আলাদা তাদের সুখ-দুঃখের কাহিনী। প্রায়শ একের কাছে যিনি বীররূপে আদৃত, অন্যের কাছে তিনি শত্রু বলে ঘৃণিত। অনুরূপভাবে একের কাছে যা জয়, অন্যের কাছে তা পরাজয় বলে বিবেচিত। একটি সংখ্যালঘু এবং অপরটি বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এরূপ দুটি জাতিকে একটি অভিন্ন রাষ্ট্রের জোয়ালে বাঁধলে ক্রমান্বয়ে তা অসন্তোষ বৃদ্ধির দিকেই এগিয়ে যাবে এবং এরূপ রাষ্ট্রের প্রয়োজনে গঠিত কাঠামোরও চূড়ান্ত ধ্বংস ডেকে আনবে।"২০

সুতরাং জিন্নাহ্ দাবি করেন যে, "ভারতের হিন্দু ও মুসলমানরা দুটি পৃথক জাতি। ভারতের মুসলমানরা একটি পৃথক জাতি। তাই তাদের প্রয়োজন একটি পৃথক আবাসভূমি বা রাষ্ট্রের।" ১৯৪০ সালের জানুয়ারি মাসে মি. জিন্নাহ্ মন্তব্য করেন যে, ভারতে দুটি জাতি রয়েছে এবং মাতৃভূমির শাসন ব্যবস্থায় উভয় জাতির অংশগ্রহণ থাকতে হবে (There are in India two nations, who both must share the govt. of their common motherland.) ।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – ব্রিটিশ-ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ ও ভারত বিভাগ

টপিক – ২৭ লাহোর প্রস্তাব, ১৯৪০

টপিক ২৭: লাহোর প্রস্তাব, ১৯৪০

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

লাহোর প্রস্তাব, ১৯৪০

ক. লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি (Background of the Lahore Resolution) : ১৯৩৭ সালের প্রথম দিকে ভারতে প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে ভারতীয় কংগ্রেস দল ছয়টি প্রদেশে পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। মুসলিম লীগ কংগ্রেসের সাথে যুক্তভাবে মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব করলে কংগ্রেস তা অস্বীকার করে। মুসলিম লীগ বাংলা ও পাঞ্জাবে সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠন করে। কিন্তু কংগ্রেস ১৯৩৭ সালের জুন মাসে ৬টি প্রদেশে এককভাবে মন্ত্রিসভা গঠন করে। অন্যদল থেকে মন্ত্রী গ্রহণ না করায় বিশেষ করে যুক্ত প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়। কংগ্রেস শাসিত প্রাদেশিক সরকারগুলো সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করতে শুরু করে। আইন-আদালত এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কংগ্রেসী পতাকা উত্তোলন ও 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত গাইবার ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে ভারতের বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়। এ ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় হিন্দু-মুসলমান স্বাভাবিক জীবন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এরূপ অবস্থায় মুসলমান নেতৃবৃন্দ নিজেদের ভাগ্য সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা শুরু করে।

লাহোর প্রস্তাব, ১৯৪০

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ এ সময় তাঁর 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' (Two Nations Theory) উত্থাপন করেন। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ অবিভক্ত পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে মুসলিম লীগের অধিবেশন বসে। এ অধিবেশনে অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ 'লাহোর প্রস্তাব' উত্থাপন করেন। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ২৪ মার্চ প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

লাহোর প্রস্তাব, ১৯৪০

খ. মূল লাহোর প্রস্তাব এবং এর বৈশিষ্ট্যসমূহ (Lahore Resolution: Main Features): মূল লাহোর প্রস্তাবটি ছিল নিম্নরূপ:

১. "নিখিল ভারত মুসলিম লীগ দৃঢ়তার সাথে পুনঃঘোষণা করছে যে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে যে যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা রয়েছে তা এ দেশের উদ্ভূত অবস্থার প্রেক্ষিতে অসঙ্গত ও অকার্যকর। বিধায় তা ভারতীয় মুসলমানদের জন্য অগ্রহণযোগ্য।"

২. "সমস্ত সাংবিধানিক পরিকল্পনা নতুনভাবে বিবেচনা না করা হলে মুসলিম ভারত অসন্তুষ্ট হবে এবং মুসলমানদের অনুমোদন ও সম্মতি ব্যতিরেকে সংবিধান রচিত হলে কোনো সংশোধিত পরিকল্পনাও তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।"

৩. "নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সুচিন্তিত অভিমত এরূপ যে, ভারতে কোনো শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা কার্যকর হবে না বা মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না যদি তা নিম্নবর্ণিত মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে রচিত না হয়: (ক) ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সংলগ্ন বা সন্নিহিত স্থানসমূহকে 'অঞ্চল' হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে, (খ) প্রয়োজন অনুযায়ী সীমানা পরিবর্তন করে এমনভাবে গঠন করতে হবে যেখানে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান এলাকাগুলো 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' (Independent States) গঠন করতে পারে, (গ) 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের' সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাষ্ট্র বা প্রদেশসমূহ হবে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম।"

লাহোর প্রস্তাব, ১৯৪০

৪. "এ সমস্ত অঞ্চলের সংখ্যালঘুদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য অধিকার এবং স্বার্থরক্ষার জন্য তাদের সাথে পরামর্শ সাপেক্ষে সংবিধানে কার্যকর ও বাধ্যতামূলক রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করতে হবে। ভারতবর্ষের মুসলমান জনগণ যেখানে সংখ্যালঘু সেখানে তাদের সঙ্গে পরামর্শ সাপেক্ষে এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাথে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য অধিকার এবং স্বার্থরক্ষার জন্য পরামর্শ সাপেক্ষে সংবিধানে পর্যাপ্ত কার্যকর ও বাধ্যতামূলক রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করতে হবে। লাহোর প্রস্তাবের মূলধারাগুলো বিশ্লেষণ করলে এর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায় :

১. ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সংলগ্ন বা সন্নিহিত স্থানসমূহকে 'অঞ্চল' হিসেবে চিহ্নিতকরণ।

২. ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বভাগের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোকে নিয়ে 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' (Independent গঠন। States)

লাহোর প্রস্তাব, ১৯৪০

৩. এসব স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের জন্য প্রয়োজনবোধে ভারতবর্ষের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলোর সীমানা পরিবর্তন।

৪. এসব স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রদেশ বা অঙ্গরাষ্ট্রগুলো হবে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম।

৫. সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর সাথে পরামর্শ করে তাদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সংবিধানে পর্যাপ্ত, কার্যকর ও বাধ্যতামূলক বিধান করা।

লাহোর প্রস্তাব, ১৯৪০

গ. মূল লাহোর প্রস্তাবের সংশোধন (Amendment of Original Lahore Resolution): ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবে সর্বপ্রথম ভারতে 'একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের' (Independent States) দাবি উত্থাপন করা হয়। ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত জিন্নাহ্ লাহোর প্রস্তাব ব্যাখ্যা করার সময়, 'একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের' (States) কথাই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জিন্নাহ্ ও গান্ধীর মধ্যে যে পত্র বিনিময় হয় সেখানে জিন্নাহ্ সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন যে, মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো নিয়ে 'একটি মুসলিম রাষ্ট্র' (State) গঠিত হবে। ২২ ১৯৪৬ সালের ৯ এপ্রিল দিল্লিতে আইনসভার মুসলিম লীগ সদস্যদের একটি বিশেষ কনভেনশনে 'একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' (Independent States) কথাটি সংশোধন করে 'একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র' (Independent State) গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।২৩ এ বিশেষ কনভেনশন কমিটির সভায় বাংলার মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাশিম এ সংশোধনী প্রস্তাবের সমালোচনা করে বলেন যে, "১৯৪০ সালের মূল লাহোর প্রস্তাব সংশোধন করার ক্ষমতা মুসলিম লীগের টিকেটে নির্বাচিত আইনসভাসমূহের সদস্যদের এ বিশেষ কনভেনশনের নেই।"

লাহোর প্রস্তাব, ১৯৪০

তিনি আরও বলেন যে, "অন্য একটি রাষ্ট্রের প্রায় এক হাজার মাইল ভূ-ভাগ দ্বারা বিচ্ছিন্ন দুটি দূরবর্তী অঞ্চল নিয়ে কখনো একটি রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। বিশেষ কমিটির সভাপতি হিসেবে মি. জিন্নাহ্ বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, টাইপের ভুলে লাহোর প্রস্তাবে 'State' শব্দটির সাথে 's' অক্ষরটি যুক্ত হয়েছিল। কিন্তু মূল লাহোর প্রস্তাব পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, বার বার 'States' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। মূলত শব্দ পরিবর্তনের এ ঘটনাটি ছিল পূর্ব পরিকল্পিত এবং ষড়যন্ত্রমূলক। কেননা মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশন ব্যতীত এরূপ 'বিশেষ কনভেনশনে' এভাবে লাহোর প্রস্তাব সংশোধন করার ক্ষমতা ছিল না।

লাহোর প্রস্তাব, ১৯৪০

ঘ. লাহোর প্রস্তাবের গুরুত্ব ও ফলাফল (Importance and Effects of the Lahore Resolution) : ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' অবিভক্ত ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করে। লাহোর প্রস্তাব গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত কংগ্রেস এবং ব্রিটিশ সরকারের সাথে আপস-মীমাংসা করে চলা, কাকুতি-মিনতি করে স্বার্থ সংরক্ষণ করাই ছিল মুসলিম লীগের রাজনীতির বৈশিষ্ট্য। লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হবার পর মুসলিম লীগের রাজনীতিতে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের সুযোগ উপস্থিত হয়। এছাড়া মুসলমানদের মধ্যে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়।

অপরদিকে, হিন্দুরা লাহোর প্রস্তাবকে মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেনি। গান্ধীর মতে, লাহোর প্রস্তাব মেনে নেওয়ার অর্থ 'ভারতকে ব্যবচ্ছেদ করা' এবং তা হবে একটি 'পাপ কাজ'। জওহেরলাল নেহেরু বলেন, "লাহোর প্রস্তাব মেনে নিলে ভারত হয়ে পড়বে বলকান রাষ্ট্রগুলোর ন্যায় ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত কর্তৃত্ববাদী পুলিশী রাষ্ট্র।" লাহোর প্রস্তাবকে মুসলিম লীগ বিরোধী পত্রিকাগুলো 'পাকিস্তান প্রস্তাব' বলে অভিহিত করে সমালোচনা শুরু করে। তাদের অপবাদই পরে মুসলিম লীগের জন্য সুবাদে পরিণত হয়। লাহোর প্রস্তাব 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামেই পরিচিতি অর্জন করে। এ লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতেই ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীন 'পাকিস্তান' রাষ্ট্র গঠিত হয়।নশ্চীচীর। হাত হারাতে নারীকে বিলাসী বিশ্বেরী প্রাবল্যাটে আসে।

লাহোর প্রস্তাব, ১৯৪০

স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের পটভূমিতে লাহোর প্রস্তাবের গুরুত্ব (Importance of the Lahore Resolution in the Background of Independent Sovereign Bangladesh): কোনো কোনো রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকের মতে, "লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল।" মূল লাহোর প্রস্তাবে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব ভূ-ভাগ নিয়ে 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' গঠনের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ মুসলিম লীগ নেতাদের মনে প্রাধান্য বিস্তার করায় ১৯৪৬ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ সংসদীয় কনভেনশনের মূল লাহোর প্রস্তাবের 'রাষ্ট্রসমূহ' (States) কথাটি সংশোধন করে 'একটি রাষ্ট্র' (State) গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

লাহোর প্রস্তাব, ১৯৪০

লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে সুসংগঠিত বাঙালি জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ বাঙালি জনগণ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করে। নির্বাচনের পর পাকিস্তান সরকার বাঙালিদের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র শুরু করে। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে স্বাধিকার অর্জনে ব্যর্থ হয়ে এবং নরপিশাচ ইয়াহিয়ার পাশবিক অত্যাচারে বাধ্য হয়ে বাঙালি জনগণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ দশ মাস সশস্ত্র যুদ্ধের পর বাঙালি জনগণ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত স্বাধীনতা অর্জন করে। ভারতের পূর্বাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। কাজেই বলা যায় যে, 'লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল'-এ কথাটিও সম্পূর্ণ সঠিক নয়। কেননা লাহোর প্রস্তাবে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার কথা প্রাধান্য পেলেও বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী চেতনা থেকে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – ব্রিটিশ-ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ ও ভারত বিভাগ

টপিক – ২৮ মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা, ১৯৪৬

টপিক ২৮: মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা, ১৯৪৬

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা, ১৯৪৬

ক. পটভূমি (Background) : ভারতীয় রাজনৈতিক শাসনতান্ত্রিক সমস্যাবলি নিরসনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলি ১৯৪৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি একটি 'মন্ত্রিমিশন' গঠন করেন। মার্চ মাসে এ মন্ত্রিমিশন ভারতে আগমন করে। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার তিন সদস্য নিয়ে গঠিত মন্ত্রিমিশনের সদস্যরা ছিলেন- (১) স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্, (২) লর্ড প্যাথিক লরেন্স ও (৩) এ. ডি. আলেকজান্ডার। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ ছিলেন মন্ত্রিমিশনের নেতা। মন্ত্রিমিশন ভারতের স্বাধীনতা প্রদানের পদ্ধতি প্রণয়ন এবং ভবিষ্যৎ সংবিধান প্রণয়নের জন্য কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করেন। কিন্তু উভয় দলের মধ্যে মতৈক্য সৃষ্টি না হওয়ায় মন্ত্রিমিশন তাঁদের নিজস্ব পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। এটাই 'মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা' নামে খ্যাত।

মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা, ১৯৪৬

খ. মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ (গ্রুপিং ব্যবস্থা) [Main Features of the Cabinet Mission Plan (grouping system)] : ১৯৪৬ সালের মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল নিম্নরূপ :

ক. দীর্ঘমেয়াদি প্রস্তাব

১. 'ভারতীয় ইউনিয়ন' নামে সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন: ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যগুলো নিয়ে 'ভারতীয় ইউনিয়ন' নামে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে কেবল প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ, মুদ্রা, শুল্ক ও মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত বিষয়।

২. প্রদেশগুলোর ক্ষমতা: উপরোক্ত বিষয় ছাড়া বাদবাকি বিষয় পরিচালনার ক্ষমতা থাকবে প্রদেশগুলোর হাতে।

৩. শাসন ও আইন বিভাগের গঠন: ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যগুলোর প্রতিনিধিদের নিয়ে কেন্দ্রীয় শাসন ও আইন বিভাগ গঠিত হবে।

মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা, ১৯৪৬

৪. প্রদেশগুলো ৩টি গ্রুপে বিভক্তকরণ: ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলো তিনটি গ্রুপে বিভক্ত হবে। হিন্দুপ্রধান মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্ত প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হবে 'ক' গ্রুপ। 'খ' গ্রুপ গঠিত হবে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে। অপেক্ষাকৃত কম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলা ও আসাম প্রদেশ নিয়ে 'গ' গ্রুপ গঠিত হবে।

৫. প্রদেশ ও গ্রুপের নিজস্ব সরকার ও সংবিধান: প্রত্যেক গ্রুপের এবং গ্রুপের অধীনে প্রদেশগুলো নিজ নিজ সরকার গঠন ও সংবিধান প্রণয়ন করতে পারবে।

৬. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন: প্রদেশগুলো পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করবে।

৭. গ্রুপ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার স্বাধীনতা: সংবিধান প্রণয়নের পর প্রদেশগুলো প্রয়োজনবোধে যে কোনো 'গ্রুপ' থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে।

মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা, ১৯৪৬

৮. গণপরিষদ গঠন: ভারতীয় ইউনিয়নের জন্য সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সকল গ্রুপের প্রতিনিধি নিয়ে একটি গণপরিষদ গঠিত হবে। গণপরিষদে সংখ্যানুপাতিক প্রাদেশিক সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকবে এবং প্রতি দশ বছর পর যে কোনো প্রদেশের অনুরোধে সংবিধানের শর্তাবলি পুনর্বিবেচনা করা যাবে।

৯. গণপরিষদকে ৩টি গ্রুপে বিভক্তকরণ: গণপরিষদের আসন সংখ্যা হবে ৩৮৫। এর মধ্যে ১৮৭ আসনবিশিষ্ট 'ক' গ্রুপে ১৬৭টি সাধারণ আসন ও ২০টি মুসলিম আসন; ৩৫ আসনবিশিষ্ট 'খ' গ্রুপে ৯টি সাধারণ আসন, ২২টি মুসলিম আসন ও ৪টি শিখ আসন এবং ৭০ আসনবিশিষ্ট 'গ' গ্রুপে ৪০টি সাধারণ এবং ৩০টি মুসলিম আসনের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও ৯৩টি আসন দেশীয় রাজ্যগুলির জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়।

মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা, ১৯৪৬

ছকের সাহায্যে 'গ্রুপ'গুলোর বিন্যাস দেখানো হলো :[২৭]

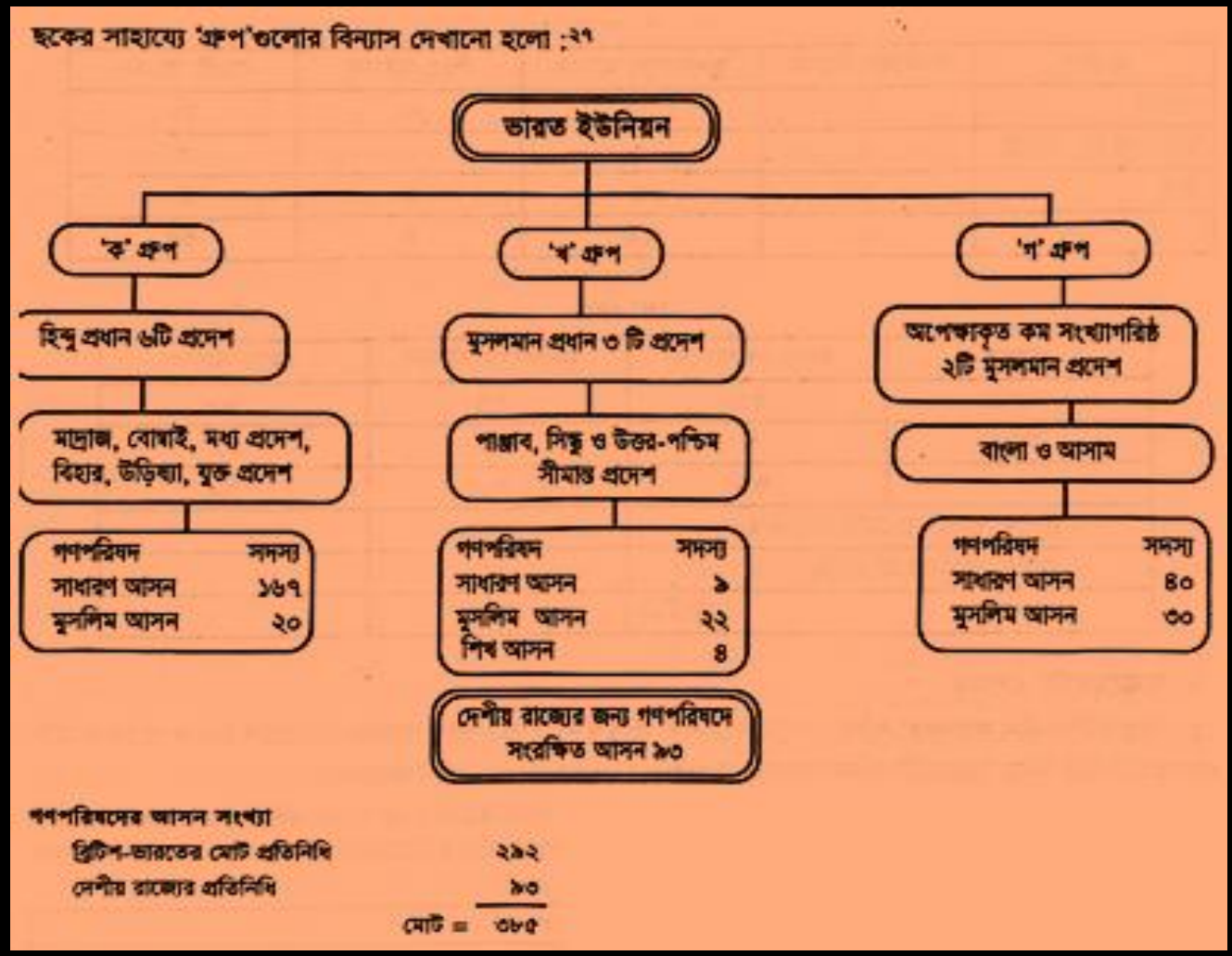

গণপরিষদের আসন সংখ্যা

ব্রিটিশ-ভারতের মোট প্রতিনিধি	২৯২
দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি	৯৩
মোট =	৩৮৫

মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা, ১৯৪৬

মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনায় ব্রিটিশ-ভারতের গণপরিষদের তিনটি গ্রুপের প্রতিনিধি সংখ্যা বা আসন বিন্যাস করা হয়। এ আসন বিন্যাস নিম্নরূপ :[২৮]

'ক' গ্রুপ

প্রদেশ	সাধারণ আসন	মুসলমান আসন	মোট আসন
মাদ্রাজ	৪৫	৪	৪৯
বোম্বাই	১৯	২	২১
যুক্তপ্রদেশ	৪৭	৮	৫৫
বিহার	৩১	৫	৩৬
মধ্যপ্রদেশ	১৬	১	১৭
উড়িষ্যা	৯	০	৯
	১৬৭	২০	১৮৭

মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা, ১৯৪৬

'খ' গ্রুপ

প্রদেশ	সাধারণ আসন	মুসলমান আসন	শিখ আসন	মোট আসন
পাঞ্জাব	৮	১৬	৪	২৮
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত	০	৩	০	৩
সিন্ধু	১	৩	০	৪
	৯	২২	৪	৩৫

'গ' গ্রুপ

প্রদেশ	সাধারণ আসন	মুসলমান আসন	মোট আসন
বাংলা	৩৩	২৭	৬০
আসাম	৭	৩	১০
	৪০	৩০	৭০
ব্রিটিশ-ভারতের মোট প্রতিনিধি		২৯২	
দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি		৯৩	
	মোট =	৩৮৫	

মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা, ১৯৪৬

খ. স্বল্পমেয়াদি প্রস্তাব

১. 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার' গঠন: নতুন সংবিধান প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত গভর্নর জেনারেল প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধি নিয়ে 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার' (Interim Government.) গঠন করবেন।

২. ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের বিলুপ্তি: সংবিধান প্রণয়ন এবং ভারত ইউনিয়ন গঠিত হলে দেশীয় রাজ্যগুলোর ওপর থেকে ব্রিটিশ সম্রাটের সার্বভৌম ক্ষমতা বিলুপ্ত হবে। দেশীয় রাজ্যগুলো ভারতীয় ইউনিয়নের সাথে নিজস্ব স্বার্থ সম্পর্কে আলোচনা করবে।

মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা, ১৯৪৬

গ. মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনার ব্যর্থতা (Failure of the Cabinet Mission Plan): ১৯৪৬ সালে 'মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা' ঘোষিত হবার পর গভর্নর জেনারেল ঘোষণা করেন যে, যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করবে তারাই 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার' গঠন করবে। মুসলিম লীগ মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনার বাধ্যতামূলক গ্রুপিং ব্যবস্থা, প্রদেশগুলোর নিজস্ব সংবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের আশ্বাসের প্রেক্ষিতে ১৯৪৬ সালের ৬ জুন মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে রাজি হয়।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস 'বাধ্যতামূলক গ্রুপিং ব্যবস্থা' এবং 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে' যোগদান করতে অস্বীকার করে। ব্রিটিশ সরকার 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার' গঠন স্থগিত রেখে ১৯৪৬ সালের ২৯ জুন একটি 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' গঠন করে। মুসলিম লীগ ব্রিটিশ সরকারকে ওয়াদা ভঙ্গকারী বলে সমালোচনা করে এবং মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা থেকে সম্মতি প্রত্যাহার করে নেয়। কংগ্রেস এ সুযোগে 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে' যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরূপ পরিস্থিতিতে মুসলিম লীগ ১৬ আগস্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' (Direct Action Day) পালনের আহ্বান জানায়। এর ফলে কলিকাতা ও ভারতের অন্যান্য স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেঁধে যায়। ২৯ ১৯৪৬ সালের ২৪ আগস্ট কংগ্রেস জওহেরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে ১২ সদস্যবিশিষ্ট 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার' গঠন করার কথা ঘোষণা করে।

মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা, ১৯৪৬

মুসলিম লীগ এর প্রতিবাদে ১ সেপ্টেম্বর 'কালো দিবস' (Black day) হিসেবে পালন করে। ১৯৪৬ সালের ২ সেপ্টেম্বর পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে গঠিত 'অর্ন্তবর্তী সরকার' কার্যভার গ্রহণ করে। এর ফলে সমগ্র উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়াভেল বাধ্য হয়ে মুসলিম লীগকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদানের অনুরোধ জানায়। ১৯৪৬ সালের ১৫ অক্টোবর লিয়াকত আলী খানের নেতৃত্বে ৫ সদস্যবিশিষ্ট মুসলিম লীগ নেতাগণ 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে' যোগদান করেন। কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে সম্পর্ক এত তিক্তরূপ ধারণ করে যে, 'অন্তর্বর্তী সরকার' দীর্ঘদিন টিকে থাকতে ব্যর্থ হয়। এর ফলে মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। ব্রিটিশ সরকার এরপর ভারত বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – ব্রিটিশ-ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ ও ভারত বিভাগ

টপিক – ২৯ ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন

টপিক ২৯: ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন

১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় সব মুসলিম আসনে মুসলিম লীগ নির্বাচনে জয়লাভ করে। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচন ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে সর্বশেষ নির্বাচন। এ নির্বাচনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কেননা মুসলিম লীগ এ নির্বাচনকে পাকিস্তানের পক্ষে 'গণভোট' বলে প্রচারণা চালায়। এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে। এ নির্বাচনে বাংলার প্রাদেশিক আইনসভার নিম্নকক্ষে ২৫০টি আসন ছিল। এর মধ্যে মুসলমান আসন ছিল ১২১টি এবং হিন্দু আসন ছিল ৯৮টি। মোট ভোটার ছিল ৮২,২৮,০২৩ জন। এর মধ্যে মুসলমান ভোটার ছিল ৪৫,৪০,৩৫৫ জন। অবশিষ্ট ভোটারগণ ছিলেন হিন্দু, ইউরোপীয়ান, এ্যাংলো ইন্ডিয়ান এবং ভারতীয় খ্রিস্টান।

এ নির্বাচনে মুসলিম লীগের নির্বাচনি ইস্তেহারের অঙ্গীকার ছিল ধর্মভিত্তিক পৃথক রাষ্ট্র, বাংলা প্রদেশ থেকে জমিদারি উচ্ছেদ, কৃষির উন্নতি, খাদ্য সমস্যা দূর করা, পাটের বাজার স্থিতিশীল করা, কলকারখানা জাতীয়করণ, কুটির শিল্পের বিকাশ, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু ইত্যাদি। কংগ্রেসের নির্বাচনি ইস্তেহারের অঙ্গীকার ছিল ভারতের অখণ্ডতা রক্ষা, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা, প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা, কৃষি ও শিল্পের সংস্কার ও আধুনিকায়ন ইত্যাদি।

১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন

বাংলা প্রদেশে এ নির্বাচনে লড়াই হয় মূলত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে। কেননা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টি 'পাকিস্তান' দাবিতে নীরব থাকায় দুর্বল হয়ে পড়ে। নির্বাচনে তাদের ভরাডুবি ঘটে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের নির্বাচনে কংগ্রেস হিন্দু আসনে এবং মুসলিম লীগ মুসলিম আসনে বিজয়ী হয়। ভারতের প্রদেশগুলোতে মুসলমান আসন ছিল ৪৮২টি। এর মধ্যে মুসলিম লীগ পায় ৪২৩টি।

হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী এবং আবুল হাশিমের প্রচেষ্টায় সমগ্র ভারতের মধ্যে একমাত্র বাংলা প্রদেশেই মুসলিম লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সীমান্ত গান্ধী খান আব্দুল গফফার খানের 'লালকোর্তা দল' এবং পাঞ্জাবে খিজির হায়াত খানের 'ইউনিয়নিস্ট পার্টি' মুসলিম লীগকে পরাজিত করে মন্ত্রিসভা গঠন করে।

১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন

নিম্নে একটি সারণির সাহায্যে ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক আইনসভায় বাংলা প্রদেশসহ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের নির্বাচনের ফলাফল দেখানো হলো :

১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনের ফলাফল[৩০]

প্রদেশ	কংগ্রেস	জাতীয়তাবাদী মুসলমান	মুসলিম লীগ	হিন্দু মহাসভা	কমিউনিস্ট	অন্যান্য	মোট আসন
মাদ্রাজ	১৬৫	-	২৯	-	২	১৯ নির্দল	২১৫
বাংলা	৮৬	-	১১৩	১	৩	১ তপশীলী ২৫ ইউরোপীয়ান ৯ লীগ বহির্ভূত মুসলমান ২ নির্দল	২৫০
বোম্বাই	১২৫	-	৩০	-	২	১৬ নির্দল ১ আর.ডি.পি	১৭৫
পাঞ্জাব	৫১	-	৭৩			২০ ইউনিয়নিস্ট ৯ নির্দল ২২ আকালী	১৭৫
যুক্ত প্রদেশ	১৫৩	৭	৫৪	-	-	১৩ নির্দল ১ কংগ্রেস সমর্থিত মুসলমান	২২৮

১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন

বিহার	৯৮	-	৩৪	-	-	৩ আদিবাসী ৫ মোমিন ১২ নির্দল	১৫২
সিন্ধু	১৮	৪	২৭			৩ ইউরোপীয়ান ৪ কংগ্রেস সমর্থিত নির্দল ৪ মুসলিম লীগ সমর্থিত নির্দল	৬০
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৩০	২	১৭			১ আকালী	৫০
মধ্য প্রদেশ	৯২	-	১৩	১	-	৬ নির্দল ১ তপশীলী	১১২
আসাম	৫৮	৩	৩১	-	-	৭ নির্দল ৭ ইউরোপীয়ান	১০৮
উড়িষ্যা	৪৭	-	৪	-	১	৪ মনোনীত ৪ নির্দল	৬০
মোট সংখ্যা	৯২৩	১৬	৪২৫	২	৮	২০৪	১৫৮৫

১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন

১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের গুরুত্ব

Importance of the Provincial election of 1946

১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের গুরুত্ব নিম্নরূপ:

১. দায়িত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্তকরণ: ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর ভারত উপমহাদেশে যে দায়িত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়েছিল তা ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের পর আরো বিকশিত হয়। সরকারের মন্ত্রিসভা বা শাসন বিভাগ তাদের কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকার বিধান আরো সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

২. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্র প্রসারিতকরণ: ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হয়েছিল এবং যা' ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল তা' আরো যথার্থ ও অর্থবহ হয়ে উঠে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের পর।

৩. দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তি সুদৃঢ়করণ: ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ 'দ্বি-জাতি তত্ত্বের' ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করে প্রচার-প্রচারণা চালায়। নির্বাচনে মুসলিম লীগের প্রতি মুসলমান ভোটাররা আস্থা প্রকাশ করে। এর ফলে 'দ্বি-জাতি তত্ত্বের' ভিত্তি সুদৃঢ় হয়।

১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন

৪. 'পাকিস্তান' দাবির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি: ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের 'পাকিস্তান' দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম লীগ এ নির্বাচনে 'পাকিস্তান' দাবিকে 'ম্যান্ডেট' হিসেবে ঘোষণা করে। মুসলমান জনগণ মুসলিম লীগকে ভোট দিয়ে 'পাকিস্তান' দাবির প্রতি তাদের ম্যান্ডেট ঘোষণা করে।

৫. মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি: ১৯৪৬ সালের এ নির্বাচনে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে মুসলিম লীগ ভারত উপমহাদেশে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র মুখপাত্র হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়।

৬. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি: ১৯৪৬ সালের এ নির্বাচনে অবিভক্ত বাংলা প্রদেশের মুসলিম লীগ সভাপতি হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীর অসামান্য সাংগঠনিক মেধা, যোগ্যতা ও প্রচেষ্টার ফলে মুসলিম লীগ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। তিনি মুসলিম লীগকে বাংলার উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি গণসংগঠনে রূপান্তর ঘটান। কেননা ইতিপূর্বে মুসলিম লীগ ছিল নবাব-জমিদার-জোতদারদের সংগঠন। তিনি এবং প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সম্পাদক আবুল হাশিম মুসলিম লীগকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। নির্বাচনের পর হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – ব্রিটিশ-ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ ও ভারত বিভাগ

টপিক – ২৭ লাহোর প্রস্তাব, ১৯৪০

টপিক ৩০: বাংলায় মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা (সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা)

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বাংলায় মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা (সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা)

১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ অবিভক্ত বাংলায় হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের নেতৃত্বে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। এ নির্বাচনে মুসলিম লীগ ১১৩টি আসন লাভ করে। সমগ্র ভারতের মধ্যে একমাত্র অবিভক্ত বাংলা প্রদেশেই মুসলিম লীগ একক দল হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়। প্রাদেশিক আইনসভায় মুসলিম লীগ দলীয় সদস্যগণ হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীকে তাঁদের 'সংসদীয় নেতা' (Parliamentary Leader) নির্বাচিত করেন। ১৯৪৬ সালের ২৪ এপ্রিল হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী ৮ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এ ৮ জনের মধ্যে ৭ জন ছিলেন মুসলিম লীগ দলীয় সদস্য এবং ১ জন ছিলেন তপশীলী হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত।

বাংলায় মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা (সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা)

মুসলিম লীগেরই একটি অংশ খাজা নাজিমুদ্দিন, মওলানা আকরাম খাঁন প্রমুখের নেতৃত্বে হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাতে থাকে। মুসলিম লীগের এ প্রতিক্রিয়াশীল অংশটির পেছনে মদদ দিচ্ছিলেন জিন্নাহ্, ইস্পাহানিসহ অবাঙালি মুসলিম লীগ নেতাগণ। এ সময়ে ব্রিটিশ সরকার ভারত বিভক্তির পাশাপাশি বাংলা ও পাঞ্জাবকেও ধর্মীয় ভিত্তিতে ভাগ করার চিন্তাভাবনা শুরু করলে সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের মতো মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশটি এর বিরোধিতা করে। ফলে মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় হাইকমান্ডের সাথে অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগের নেতা সোহ্রাওয়ার্দী-হাশিমের বিরোধ সৃষ্টি হয়। ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বাংলার বিধানসভার হিন্দু সদস্যগণ বাংলা প্রদেশ বিভক্তির পক্ষে রায় প্রদান করলে বাংলা বিভাগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – ব্রিটিশ-ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ ও ভারত বিভাগ

টপিক – ৩১ ১৯৪৬-৪৭ সালে 'স্বাধীন সার্বভৌম অখণ্ড বাংলার' পরিকল্পনা, তাৎপর্য ও পরিণতি

টপিক ৩১: ১৯৪৬-৪৭ সালে 'স্বাধীন সার্বভৌম অখণ্ড বাংলার' পরিকল্পনা, তাৎপর্য ও পরিণতি

This Topic is important for

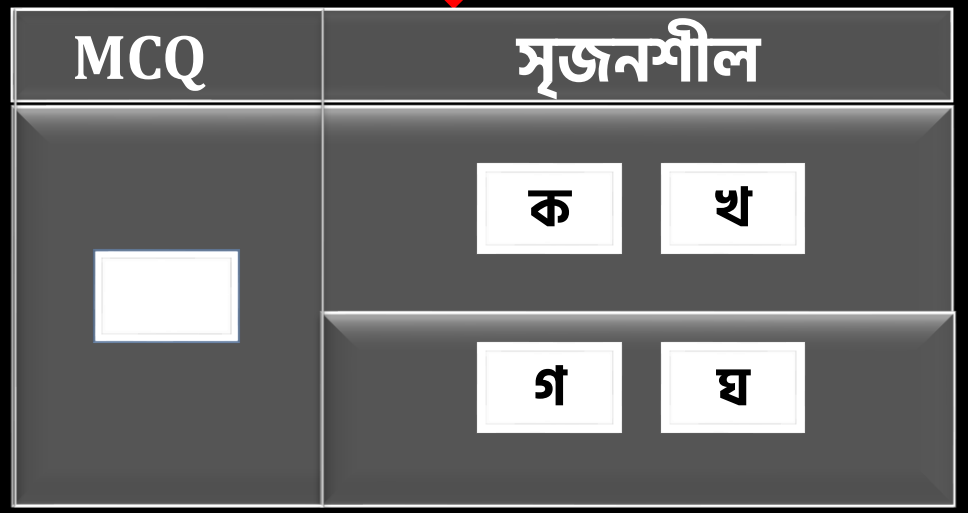

১৯৪৬-৪৭ সালে 'স্বাধীন সার্বভৌম অখণ্ড বাংলার' পরিকল্পনা, তাৎপর্য ও পরিণতি

১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারত বিভাগ এবং এর পাশাপাশি বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলসহ অনেক কংগ্রেস নেতাও ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের সিদ্ধান্তকে মেনে নেন।

বাঙালি জাতির এ দুঃসময়ে হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী ও অবিভক্ত বাংলার সে সময়ের মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল হাশিম ধর্মের ভিত্তিতে বাংলা প্রদেশকে বিভক্তির বিরোধিতা করেন। শরৎচন্দ্র বসু, কিরণ শংকর রায়, সত্য রঞ্জন বক্সীর মতো প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক কংগ্রেস ও ফরোয়ার্ড ব্লক নেতাগণও বাংলাকে বিভক্ত করার বিরোধিতা করেন। হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী এসব প্রগতিশীল নেতার সাথে পরামর্শ করে ১৯৪৭ সালের ২৭ এপ্রিল 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা' রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ৩১ 'স্বাধীন বাংলা' রাষ্ট্রগঠন আন্দোলনের নেতাগণ বিশেষ করে অবিভক্ত বাংলার কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল নেতাগণ ১২ সদস্যবিশিষ্ট একটি যৌথ কমিটি গঠন করেন। এ যৌথ কমিটি ১৯৪৭ সালের ২০ মে স্বাধীন বাংলার ভবিষ্যৎ সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি রূপরেখাও প্রণয়ন করে। এ রূপরেখা অনুযায়ী স্বাধীন সার্বভৌম অখণ্ড বাংলার ভবিষ্যৎ সংবিধানের বৈশিষ্ট্য হবে নিম্নরূপ:

১৯৪৬-৪৭ সালে 'স্বাধীন সার্বভৌম অখণ্ড বাংলার' পরিকল্পনা, তাৎপর্য ও পরিণতি

১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ অবিভক্ত বাংলায় হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের নেতৃত্বে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। এ নির্বাচনে মুসলিম লীগ ১১৩টি আসন লাভ করে। সমগ্র ভারতের মধ্যে একমাত্র অবিভক্ত বাংলা প্রদেশেই মুসলিম লীগ একক দল হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়। প্রাদেশিক আইনসভায় মুসলিম লীগ দলীয় সদস্যগণ হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীকে তাঁদের 'সংসদীয় নেতা' (Parliamentary Leader) নির্বাচিত করেন। ১৯৪৬ সালের ২৪ এপ্রিল হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী ৮ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এ ৮ জনের মধ্যে ৭ জন ছিলেন মুসলিম লীগ দলীয় সদস্য এবং ১ জন ছিলেন তপশীলী হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত।

১। বাংলা হবে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। ভারতের অবশিষ্ট অংশের সাথে এর সম্পর্ক কীরূপ হবে তা স্বাধীন বাংলার পরিচালক ও সংগঠকবৃন্দই নির্ধারণ করবেন।

২। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার আইনসভা গঠিত হবে যুক্ত নির্বাচন ও সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে।

৩। স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব গৃহীত হলে বর্তমান মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভা গঠন করা হবে।

৪। অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভার প্রধানমন্ত্রী হবেন একজন মুসলমান। তবে মন্ত্রিসভায় সমান সংখ্যক মুসলমান ও হিন্দু মন্ত্রী থাকবেন।

৫। স্বাধীন বাংলার সামরিক ও পুলিশ বাহিনীসহ অন্যান্য সকল চাকরিতে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সংখ্যাসাম্যের ব্যবস্থা থাকবে।

৬। সংবিধান প্রণয়নের জন্য একটি গণপরিষদ গঠিত হবে। গণপরিষদের সদস্য সংখ্যা হবে ৩০ জন, এর মধ্যে ১৬ জন হবেন মুসলমান এবং ১৪ জন হবেন হিন্দু। তাঁরা বর্তমান আইনসভার মুসলমান ও অমুসলমান সদস্যগণের দ্বারা পৃথকভাবে নির্বাচিত হবেন।

১৯৪৬-৪৭ সালে 'স্বাধীন সার্বভৌম অখণ্ড বাংলার' পরিকল্পনা, তাৎপর্য ও পরিণতি

স্বাধীন সার্বভৌম 'বাংলা রাষ্ট্র' গঠনের প্রস্তাব এবং এর ভবিষ্যৎ সংবিধানের রূপরেখা প্রকাশিত হলে 'হিন্দু মহাসভা' এবং কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল ও ধর্মান্ধ অবাঙালি নেতাগণ এর বিরোধিতা শুরু করেন। এসব সাম্প্রদায়িক ও ধর্মান্ধ নেতাগণ ভারত বিভক্তির সাথে সাথে বাংলা এবং পাঞ্জাবের বিভক্তিরও দাবি জানান। ১৯৪৭ সালের জুন মাসে মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে মি. জিন্নাহ্ প্ররোচনায় অবাঙালি মুসলিম লীগ নেতাদের সমর্থনে ভারত বিভক্তি সংক্রান্ত মাউন্টব্যাটেনের '৩ জুন পরিকল্পনা' গৃহীত হয়। বাংলা প্রদেশের অধিবাসী হয়েও খাজা নাজিমুদ্দিন এবং মওলানা আকরাম খান সেদিন জিন্নাহকেই সমর্থন করেছিলেন, অখণ্ড বাংলাকে নয়। তবে আবুল হাশিমসহ ৭ জন প্রতিনিধি এ সিদ্ধান্তের জোরালো প্রতিবাদ করেছিলেন। ৩২ এর ফলে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারত বিভক্ত হয় এবং এর পাশাপাশি বাংলা বিভক্ত হয়ে পূর্ব অংশ 'পাকিস্তানের' সাথে এবং পশ্চিম অংশ ভারতের সাথে অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৪৬-৪৭ সালে 'স্বাধীন সার্বভৌম অখণ্ড বাংলার' পরিকল্পনা, তাৎপর্য ও পরিণতি

'স্বাধীন বাংলা' রাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন এদেশের প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক নেতাগণ। এ উদ্যোগ সফল হয়নি সে সময়ের উগ্র সাম্প্রদায়িক হিন্দু ও মুসলিম কিছু নেতার অদূরদর্শিতা ও ধর্মান্ধতার জন্য। এ ঘটনা মুসলিম লীগের প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক নেতাদেরকে বেদনাহত করে। এর ফলে ভবিষ্যতে মুসলিম লীগের প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক অংশটির সাথে সাম্প্রদায়িক অংশটির বিরোধ সৃষ্টি হয় এবং মুসলিম লীগের ভাঙনের বীজ রোপিত হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – ব্রিটিশ-ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ ও ভারত বিভাগ

টপিক – ৩২ ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন

টপিক ৩২: ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন

১৯৪৭ সালের '৩ জুনের মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা'কে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই যে আইন পাস করে তা 'ভারত স্বাধীনতা আইন' নামে খ্যাত।

ক. ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের মূল বৈশিষ্ট্য বা ধারা Main Features of the Indian Independence Act, 1947

১. দুটি ডোমিনিয়ন সৃষ্টি: এ আইনে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তান নামে দুটি 'ডোমিনিয়ন' প্রতিষ্ঠিত হয়। ডোমিনিয়নগুলো কার্যত স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কোনো আইনের কার্যকারিতা ভারত ও পাকিস্তান ডোমিনিয়নের ওপর আর থাকবে না।

২. ডোমিনিয়ন গণপরিষদ এ আইনে দুই ডোমিনিয়নের জন্য দু'টি গণপরিষদ গঠনের কথা বলা হয়। স্ব-স্ব দেশের সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব স্ব-স্ব গণপরিষদের ওপর ন্যস্ত থাকবে। সংবিধান প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত গণপরিষদ নিজ দেশের আইন পরিষদ হিসেবেও কাজ করবে।

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন

৩. ব্রিটিশ দায়-দায়িত্বের অবসান এবং দেশীয় রাজ্যের স্বাধীনতা: এ আইনের ফলে দেশীয় রাজ্যসমূহের ওপর ব্রিটিশ-রাজের দায়-দায়িত্ব থাকবে না এবং ব্রিটিশ রাজ্যের সার্বভৌমত্বও লোপ পাবে। ১৪ আগস্ট থেকে দেশীয় রাজ্যগুলো ভারত ও পাকিস্তানের যে কোনো রাষ্ট্রে যোগদান করতে পারবে অথবা স্বাধীনভাবে থাকতে পারবে।

৪. ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্টি: এ আইনের ফলে আসামের সিলেট জেলা ও পূর্ব বাংলা, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান নিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভারতের অবশিষ্টাংশ নিয়ে ভারত ডোমিনিয়ন গঠিত হয়।

৫. ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের সংশোধনী: ডোমিনিয়ন গণপরিষদ কর্তৃক সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত দুই দেশের শাসনব্যবস্থা ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের নিম্নলিখিত সংশোধন সাপেক্ষে শাসিত হবে :

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন

(i) স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বিলোপ: গভর্নর জেনারেল ও গভর্নরদের 'স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা', 'বিশেষ ক্ষমতা' ইত্যাদির অবসান ঘটবে। স্ব-স্ব মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী তাঁরা শাসনকার্য পরিচালনা করবে।

(ii) গভর্নর জেনারেল নিয়োগ: ভারত ও পাকিস্তানের মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী ব্রিটিশ-রাজ গভর্নর জেনারেল নিয়োগ করবেন।

(iii) ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ক্ষমতা হ্রাস: ডোমিনিয়নের আইনসংক্রান্ত ব্যাপারে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কোনো প্রাধান্য থাকবে না। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কোনো আইন ডোমিনিয়নে প্রযোজ্য হবে না।

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন

৬. কমনওয়েলথে থাকা বা না থাকার স্বাধীনতা: দুই ডোমিনিয়ন ইচ্ছা করলে যে কোনো সময় কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে আসতে এবং ব্রিটিশ-রাজের সাথে যেটুকু নামমাত্র যোগাযোগ রয়েছে তা ছিন্ন করতে পারবে।

৭. 'ভারত সচিব' পদের অবসান: এ আইনে 'ভারত সচিব' পদের অবসান ঘটে। তবে ভারত ইউনিয়ন এবং পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় 'কমনওয়েলথ সেক্রেটারির' ওপর।

৮. 'ভারত সম্রাট' উপাধি বিলোপ: এ আইন পাসের ফলে রাজকীয় মর্যাদা ও উপাধি হতে ব্রিটিশরাজের 'ভারত সম্রাট' উপাধি বিলুপ্ত হয়।

৯. সিভিল সার্ভেন্টদের প্রসঙ্গে: এ আইনে বলা হয় যে, ভারতীয় জনপ্রশাসনে নিয়োজিত সিভিল সার্ভেন্টস্না ভারত বা পাকিস্তান যে কোনো ডোমিনিয়ন সরকারের অধীনে চাকরি করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টের পূর্বের ন্যায় সকল সুযোগ-সুবিধা পাবে।

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন

খ. ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের তাৎপর্য ও মূল্যায়ন

Evaluation of the Importance of the Indian Independence Act of 1947

নিম্নলিখিত কারণে ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের গুরুত্ব অপরিসীম :

১. ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের পথে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বশেষ পদক্ষেপ।

২. এ আইন দ্বারা সুদীর্ঘ প্রায় ২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান এবং দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।

৩. এ আইন দ্বারা গভর্নর জেনারেল ও গভর্নরের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বিলুপ্ত করায় ভবিষ্যতে ভারত ও পাকিস্তানে সংসদীয় ও দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

৪. সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধ বা বিনা রক্তপাতে এ আইন দ্বারা দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন

তবে এ আইনের কিছু কিছু ক্ষেত্রে অস্পষ্টতার কারণে দেশীয় রাজ্য বিশেষ করে অঙ্গরাজ্যগুলো কীভাবে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সাথে যুক্ত হবে, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধান না থাকায় কাশ্মীরসহ অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। এ আইনে মূল লাহোর প্রস্তাবকে এড়িয়ে যাওয়ার এবং দায়িত্বশীল সরকার গঠন সম্পর্কে স্পষ্ট বিধান না থাকায় পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানে সংকট সৃষ্টি হয়। এর ফলে পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বারা নিগৃহীত ও শোষিত হতে থাকে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – ব্রিটিশ-ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ ও ভারত বিভাগ

টপিক – ৩৩ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

টপিক ৩৩: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

সুহৃদ টিভিতে 'একাত্তর চ্যানেলে' মুক্তিযুদ্ধের ওপর একটি ছবি দেখছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব তাঁকে রোমাঞ্চিত করছিল। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী এদেশীয় কিছু লোকের কর্মকাণ্ড তার মনে এদের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করে। এ সময় তার পলাশীর যুদ্ধের কথা মনে পড়ছিল। মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের সাথে সে মিল খুঁজে পেয়েছিল-

ক. আলীবর্দী খান, সিরাজউদ্দৌলার সাথে
খ. ক্লাইভ, ড্রেকদের সাথে
গ. মীর জাফর, জগৎশেঠদের সাথে
ঘ. মীরমদন, মোহনলালদের সাথে

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কত সালে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার 'দেওয়ানি সনদ' লাভ করে?

ক. ১৫৬৫
খ. ১৬৬৫
গ. ১৭৫৭
ঘ. ১৭৬৫

দ্বৈতশাসন প্রবর্তন করেন কে?

ক. লর্ড ক্লাইভ
খ. উইলিয়াম হ্যামিল্টন
গ. লর্ড কর্নওয়ালিস
ঘ. ওয়ারেন হেস্টিংস

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় কত সালে?

ক. ১৬৯৩ খ. ১৭৯৩

গ. ১৭৬৫ ঘ. ১৮৫৭

'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' করা হয় কোন্ গভর্নর জেনারেলের সময়ে?

ক. রবার্ট ক্লাইভ খ. ওয়ারেন হেস্টিংস

গ. লর্ড কর্নওয়ালিশ ঘ. লর্ড উইলিয়াম

ব্রিটিশ শাসনামলে অধিকাংশ মুসলমান জমিদার তাদের জমিদারি হারানোর কারণ হলো-

i. ভূমি রাজস্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পাওয়া

ii. ওয়াকফ সম্পত্তি ব্রিটিশদের দখলে নেয়া

iii. বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ ব্যয় করা

নিচের কোন্টি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

মহাবিদ্রোহ বা সিপাহী বিদ্রোহ হয় কত সালে?

ক. ১৭৫৭ খ. ১৭৬০

গ. ১৮৩০ ঘ. ১৮৫৭

কোন্ আইন দ্বারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিবর্তে ভারতবর্ষে সরাসরি ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়?

ক. ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং এ্যাক্ট খ. ১৭৭৩ সালের চিরস্থায়ী আইন

গ. ১৭৮৪ সালের পিটের ভারত শাসন আইন ঘ. ১৮৫৭ সালের ভারত শাসন আইন

ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে কত সালে? অথবা কত সালে ভারতে কোম্পানির শাসনের পরিবর্তে ব্রিটিশ শাসনের সূচনা হয়?

ক. ১৭৫৭ খ. ১৮৫৭

গ. ১৮৫৮ ঘ. ১৯৪৭

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০১ – ব্রিটিশ-ভারতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের বিকাশ ও ভারত বিভাগ

টপিক – ৩৪ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

টপিক ৩৪: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

নাগরিকের অধিকতর সেবা দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টির জন্য ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে দু'ভাগে ভাগ করে। 'ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন' ও 'ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন' নামে পৃথক দুটি সিটি কর্পোরেশনে রূপান্তরিত করে। [ঢা. বো. ২০২২]

প্রশ্ন :

ক. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় কখন?

খ. দ্বৈত-শাসন বলতে কী বুঝ?

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনার মূলে ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে নস্যাৎ করা- বিশ্লেষণ করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

'ক' নামক রাষ্ট্রটি বিদেশি শাসকগোষ্ঠী দ্বারা প্রায় দু'শত বছর শাসিত হয়েছে। প্রথম থেকে বিদেশি শাসকগোষ্ঠী 'ক' রাষ্ট্রে টিকে থাকার জন্য নানা কূটকৌশল অবলম্বন করে। জনগণকে খুশি করার জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আইন তৈরি করে। কিন্তু কোনো আইনই জনগণকে খুশি করতে পারেনি। অবশেষে বিদেশি শাসকগোষ্ঠী একটি আইন তৈরি করে 'ক' রাষ্ট্রটিকে দুটি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত করে স্বাধীনতা দিয়ে নিজ দেশে চলে যায়

প্রশ্ন : ।[কু. বো. ২০২২]

ক. কত সালে বঙ্গভঙ্গ সংঘটিত হয়?

খ. ৩রা জুন পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের যে ঘটনা বা আইনের মিল রয়েছে, তার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো।

ঘ. তোমার পাঠ্যপুস্তকের ঐ 'ক' রাষ্ট্রের জনগণের প্রত্যাশা পূরণে কতটুকু সফল হয়েছিল? মূল্যায়ন করো।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

X প্রদেশের জনগণ স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের জন্য আন্দোলন করছে। এ আন্দোলন দমনের জন্য X প্রদেশকে এমনভাবে ভাগ করা হয় যাতে দুটি সম্প্রদায় পরস্পরের বিরুদ্ধে স্বার্থের সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। এর মধ্যে একটি সম্প্রদায় তাদের. আন্দোলন সুসংগঠিত করার জন্য একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে। [রা. বো. ২০২২]

প্রশ্ন:

ক, সিপাহি বিদ্রোহ সংঘটিত হয় কত সালে?

খ. "ভাগ কর-শাসন কর" নীতি বলতে কী বুঝ?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সাথে ব্রিটিশ ভারতের কোন ঐতিহাসিক ঘটনার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের অনুরূপ একটি রাজনৈতিক দল ব্রিটিশ ভারতের মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় অনন্য ভূমিকা পালন করেছে-বিশ্লেষণ করো।

THANK YOU